Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ ২৩১০০১২০৩১৫

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ ২৩১০০১২০৩১৫

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান, আইডিঃ ২৩১০০১২০৩১৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ইসরাত জাহান

আইডিঃ ২৩১০০১২০৩১৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

অধ্যায় সমূহ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১. প্রথম অধ্যায়:	ভূমিকা	1
০২. দ্বিতীয় অধ্যায়:	আধুনিক নারীবাদের ধারণা ও ইতিহাস	3
০৩. তৃতীয় অধ্যায়:	ইসলামের আবির্ভাব-পূর্ব প্রেক্ষাপট	16
০৪. চতুর্থ অধ্যায়:	জাহেলিয়াত থেকে মর্যাদায়: ইসলামের নারীভাবনা	23
০৫. পঞ্চম অধ্যায়:	ইসলামে নারীর মর্যাদা ও সম্মান।	32
০৫. ষষ্ঠ অধ্যায়:	নারীর নিরাপত্তা: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি	38
০৭: সপ্তম অধ্যায়:	ইসলামে নারীর মৌলিক অধিকার, লিঙ্গ সমতা ও ক্ষমতায়ন	45
০৮. অষ্টম অধ্যায়:	নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকা	59
০৯: নবম অধ্যায়:	আধুনিক নারীবাদ বনাম ইসলামি নারীত্ব	74
১০. দশম অধ্যায়:	পশ্চিমা নারীবাদ কি প্রকৃতপক্ষে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে?	78
১১. একাদশ অধ্যায়:	আলোচনাও বিশ্লেষন	85
১৩. ত্রয়োদশ অধ্যায়:	উপসংহার	88

প্রথম অধ্যায়

يَاالنَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَ بَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا
كَثِيۡرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَ الۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا

"হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক নফস (প্রাণ) থেকে এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, অতঃপর তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে চাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।" —সূরা আন নিসা:০১

~ভূমিকা~

"শুরু করছি পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার নামে। সীমাহীন প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যার মেহেরবানীতে যাবতীয় মহৎকর্ম সুসম্পন্ন হয় এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি যিনি হেদায়াত ও কল্যাণময় পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবাবৃন্দ এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত যত মানুষ তাঁকে অনুসরণ করবে- তাঁদের প্রত্যেকের ওপর বর্ষিত হোক রহমত-বরকত, শান্তির অফুরন্ত ধারা।"

“অউরত ইজ্জত ভি হ্যায়, রহমত ভি,
আগর সমঝ সাকো তো জান্নত ভি।”

অর্থাৎ, নরী সম্মান এবং রহমত দুটোরই প্রতীক। যদি কেউ তা বিবেক দিয়ে অনুধাবন করতে পারে তাহলে, নারী জান্নাত লাভেরও কারণ। কিন্তু বর্তমান বিশ্বপ্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নারীরা কেমন যেন নিজেদের সম্মান ও অধিকার আদায়ের যুদ্ধ নামক মরিচিকার পেছনে দৌড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। নারীরা তাদের অধিকার, সমতা ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মাপকাঠি হিসেবে নির্বাচন করেছে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও তাদের মনগড়া কিছু মতবাদ গুলোকে। বিশেষ করে আধুনিক নারীবাদ

(Feminism) নারীর সমতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অথচ ইসলাম শত শত বছর আগে নারীকে দিয়েছে পাহাড় সম মর্যাদা, যথার্থ স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকার। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারকে একটি সুষম ও নৈতিক কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপন করে।

এই প্রেক্ষাপটে আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্বের ধারণার মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়।

❖ এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- ইসলামে নারীর সম্মান ও মর্যাদা বিশ্লেষণ করা
- কুরআন ও হাদিসের আলোকে নারীর মৌলিক অধিকার উপস্থাপন করা
- আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্বের ধারণার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা
- সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি চিহ্নিত করা
- নারীর অধিকার বিষয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা

❖ গবেষণা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন :

- ইসলাম নারীদের কী কী মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে?
- ইসলামে নারীর মর্যাদা কীভাবে নির্ধারিত হয়?
- আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্বের মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?
- কেন সমাজে নারীর অধিকার বিষয়ে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা বিদ্যমান?

পরবর্তী আলোচনা গুলোতে এই প্রশ্নসমূহের যথার্থ উত্তর প্রদানের এবং গুরুত্বারোপ করা হবে ইনশা আল্লাহ।

❖ গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাটি মূলত গুণগত (Qualitative) পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসকে প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামি চিন্তাবিদদের গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ এবং আধুনিক একাডেমিক জার্নাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

~আধুনিক নারীবাদের ধারণা ও ইতিহাস ~

নারীবাদ কী—What is feminism?

নারীবাদ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Feminism', যা গ্রিক শব্দ 'Femme' (নারী) থেকে এসেছে। ১৮৩৭ খ্রিঃ ফরাসি দার্শনিক ও ইউটোপীয় সমাজবাদী চার্লস ফুরিয়ে প্রথম 'নারীবাদ' শব্দটির আনুষ্ঠানিক ব্যবহার করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। [1]

❖ আধুনিক নারীবাদ (Modern Feminism) হলো এমন একটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন, যার মূল লক্ষ্য নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এটি মূলত পশ্চিমা সমাজে নারীদের প্রতি দীর্ঘদিনের বৈষম্য, অবমূল্যায়ন ও অধিকারবঞ্চনার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠে। তবে এর কোন একক, নির্দিষ্ট বা সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা আজও নির্ধারণ করা যায়নি। কেননা, নারীবাদ একটি বহুমাত্রিক ধারণা।

1.নারীবাদ-উইকিপিডিয়া

❖ এস্টেল বি ফ্রীডম্যান (উংঃবষষব ই. ঋৎববফসধহ) তার 'ঘড় ঞঁৎহরহম ইধপশ' নামক গ্রন্থে নারীবাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে, "নারীবাদ একটি বিশ্বাস যে, নারী ও পুরুষের অন্তর্নিহিত মূল্যমান সমান। যেহেতু অধিকাংশ সমাজ ব্যবস্থা পুরুষকে গোষ্ঠী হিসাবে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে, কাজেই নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক আন্দোলন অত্যাবশ্যক।"[2]

❖ **নারীবাদের চারটি ধারণাঃ-**

1. Gender equality
2. Women's Liberation
3. Individual freedom
4. women's empowerment

1. নারীবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো **"Gender Equality" বা লিঙ্গসমতা।** লৈঙ্গিক সমতা বলতে কোনও ব্যক্তির লিঙ্গ (নাবালক ছেলে বা মেয়ে এবং সাবালক পুরুষ কিংবা নারী) নির্বিশেষে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পদ, সুযোগ ও সুরক্ষা লাভ করা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে সমান অধিকারকে বোঝায়। তবে তার মানে এই নয় যে পুরুষ ও নারী হুবহু একই ধরনের ব্যক্তি কিংবা তাদের সাথে সম্পূর্ণ একইভাবে ব্যবহৃত হবে।[3]

2. নারীমুক্তি বা Women's Liberation হলো নারীবাদ-এর একটি Radical বা চরমপন্থী বা আমূল পরিবর্তনকামী শাখা যা ১৯৬০ এর দশকের শেষভাগ থেকে ১৯৮০ এর দশকে উদ্ভূত হয়েছিল। এর মূলনীতি হলো, নারীদের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা এবং কেবল বিদ্যমান আইন সংস্কার না করে প্রাতিষ্ঠানিক পিতৃতন্ত্রকে ভেঙে ফেলা।[4]

বৃহত্তর নারীবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, নারীমুক্তি প্রায়শই 'দ্বিতীয়-তরঙ্গের নারীবাদ' নামে পরিচিত।এটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানায় এই যুক্তিতে যে, নারীর দ্বিতীয়

---

2 নারীবাদ পরিচিতি

3 লৈঙ্গিক সমতা- উইকিপিডিয়া

4 Women Liberation Movement —wikipedia

শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা অবসানের জন্য অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং যৌন স্বাধীনতা প্রয়োজন, যা আনুষ্ঠানিক আইনি সমতার ঊর্ধ্বে।

পূর্ববর্তী নারীবাদী প্রচেষ্টাগুলোর,যেমন প্রথম-তরঙ্গের নারীবাদ, যা প্রধানত ভোটাধিকার অর্জনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। বিপরীতে, নারীমুক্তি লিঙ্গবৈষম্যের কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংস্কৃতিক মূলকে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিল।

➢ **প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ:**

আন্দোলনটির মূল দর্শন ছিল "The personal is political" বা "ব্যক্তিগতই রাজনৈতিক", যার অর্থ হলো দৈনন্দিন পারিবারিক, ব্যক্তিগত এবং পেশাগত সংগ্রামগুলো ব্যক্তিগত সমস্যা না হয়ে বরং প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক বিষয় ছিল। সহজ কথায়, ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার পেছনেও সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর প্রভাব থাকে।

- **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা:** পেশাগত বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করা এবং সমান বেতন ও ব্যক্তিগত আর্থিক বিষয়াদির ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করা (যেমন, ১৯৫০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক নারী পুরুষের অনুমোদন ছাড়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারতেন না)।
- **দেহের উপর স্বায়ত্তশাসন:** জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাতের সুযোগ সহ নিরাপদ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অধিকারের পক্ষে সমর্থন।
- **পিতৃতন্ত্রের অবসান:** পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও রাজনীতিতে পুরুষ আধিপত্যকে ন্যায্যতা প্রদানকারী সাংস্কৃতিক আখ্যানগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা।

➢ **সফলতা ও অর্জন সমূহ:**

মোটাদাগে, নারীমুক্তি আন্দোলনের সফলতাগুলোর দিকে নজর দিলে দেখা যাবে,

✓ ভোটাধিকার অর্জন,

✓ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নামে নারীদের কে ঘর থেকে বের করে কর্পোরেট জগৎ, ও বিভিন্ন পেশায় প্রবেশ করানো,

✓ নিজের শরীরের উপর পূর্ন সায়ত্তশাসন তথা নিজের দেহের ব্যপারে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা অর্জন,

✓ কর্মক্ষেত্রে ন্যায্যতা তথা 'সমান কাজের জন্য সমান মজুরি' বা " equal pay act" নীতির বাস্তবায়ন,

- ✓ প্রজজন স্বাস্থ্য তথা নিরাপদ মাতৃত্বের নামে জন্মনিয়ন্ত্রণ, গর্ভপাতের বৈধতা অর্জন, পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভ নিরোধ পিলের ব্যবহার ও পরিবারে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীদের সক্ষমতা অর্জন। [5]
- ✓ ১৯৭০ সালে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পিলের প্রবর্তন, টাইটেল নাইন (Title IX) [6]এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৪ সালের ইকুয়াল ক্রেডিট অপরচুনিটি অ্যাক্ট (Equal Credit Opportunity Act)[7]-এর মতো কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়।

"নারীর অধিকার থেকে নারীর মুক্তি: ওয়াশিংটন রাজ্যে দ্বিতীয়-তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলন" শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে, যার গুগল লিংক ফুটনোটে এড করে দেওয়া হয়েছে।

3. নারীবাদ-এর প্রেক্ষাপটে, **ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা "Individual Freedom "** হলো শারীরিক স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অন্বেষণ। এটি নারীদের পছন্দকে সীমাবদ্ধ করে এমন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলতে চায়, কিন্তু বিভিন্ন নারীবাদী চিন্তাধারার মধ্যে এর সংজ্ঞা ও প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।[8]

- ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অন্যতম ভিত্তি হলো নিজের শরীরের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ। নারীবাদীরা মনে করেন, প্রজনন অধিকার, সন্তান ধারণ করা বা না করা, গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত এবং নিজের যৌনতার স্বাধীনতা একজন নারীর একান্ত

ব্যক্তিগত অধিকার। সমাজ, রাষ্ট্র বা পরিবারের এতে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নেই।

- পিতৃতন্ত্র সমাজ ও পরিবারে নারীদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট গণ্ডি (যেমন—পোশাক, চালচলন, বিয়ের বয়স ইত্যাদি) তৈরি করে দেয়। নারীবাদী আদর্শে ব্যক্তি স্বাধীনতা হলো, সমাজের নির্ধারিত এই 'লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা' (Gender

---

5 From Women's Rights to Women's Liberation: The Second-Wave Feminist Movement in Washington State

6 টাইটেল নাইন হলো ১৯৭২ সালে প্রণীত একটি যুগান্তকারী মার্কিন নাগরিক অধিকার আইন, যা যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত যেকোনো শিক্ষা কার্যক্রম বা কর্মকাণ্ডে লিঙ্গ-ভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করে।

7 ইকুয়াল ক্রেডিট অপরচুনিটি অ্যাক্ট (ECOA) হলো ১৯৭৪ সালের একটি যুগান্তকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, যা ঋণদাতাদের জন্য জাতি, বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, বয়স বা সরকারি সহায়তা থেকে প্রাপ্ত আয়ের ভিত্তিতে ঋণ আবেদনকারীদের প্রতি বৈষম্য করাকে বেআইনি ঘোষণা করে।

8 নারীবাদি আন্দোলনে প্রাসঙ্গিকতা: ব্যাক্তিগত নাকি রাজনৈতিক?

Roles) ভেঙে নারীদের নিজের ভবিষ্যৎ, পেশা ও জীবনধারা স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করা।

4. নারী ক্ষমতায়ন হলো পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য নিজের জীবনের উপর ক্ষমতা, স্বকীয়তা এবং নিয়ন্ত্রণ অর্জনের একটি প্রক্রিয়া। এটি নারীবাদী তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দেয় এবং নারীদের সমান অধিকার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা নিশ্চিত করে।নারীবাদ নারী ক্ষমতায়নের আদর্শগত ভিত্তি প্রদান করে এবং লিঙ্গভিত্তিক মজুরি ব্যবধান, সীমিত প্রজনন অধিকার ও রাজনীতিতে স্বল্প প্রতিনিধিত্বের মতো প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যগুলো কীভাবে নারীদের পিছিয়ে রাখে, তা চিহ্নিত করে। নারী ক্ষমতায়ন হলো দৈনন্দিন জীবনে এই নারীবাদী আদর্শগুলোর সক্রিয় প্রয়োগ।

আধুনিক নারীবাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

নারীমুক্তি, নারী-স্বাধীনতা, লিঙ্গ-বিতর্ক এবং নারীবাদ (feminism) একেবারেই আধুনিক প্রপঞ্চ, এবং উদ্ভব প্রায় একইসঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকায়। এই শব্দবন্ধগুলো বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বুদ্ধিবৃত্তিক আকার পায় এবং শেষদিকে জনমুখীনতা অর্জন করে। নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নটি শতাব্দীপ্রাচীন, তবে এর বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসের শুরু মোটামুটি ১৮৩০ সাল থেকে।[9] ঐতিহাসিকভাবে নারীবাদের যাত্রাকে সাধারণত তিনটি ‘তরঙ্গ’ বা ধাপে ভাগ করা হয়[10]:

১. প্রথম তরঙ্গ(১৯ শতক থেকে ২০ শতকের প্রথমার্ধ):এই ধাপের মূল লক্ষ্য ছিল আইনি বৈষম্য দূর করা এবং নারীদের ভোটাধিকার বা 'সাফ্রেজেট মুভমেন্ট' (Suffrage Movement) অর্জন করা। ১৮৪৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেকা ফলস কনভেনশন (Seneca Falls Convention) এর মাধ্যমে এই আন্দোলন বেগবান হয়। ১৯২০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে নারীরা ভোট দেওয়ার অধিকার লাভ করেন।

---

9 বেগম রোকেয়ার সাহিত্য ও নারীবাদী চিন্তার গতিপ্রকৃতি, নাজিব ওয়াদুদ —কালি ও কলম

10 উইকিপিডিয়া : নারীবাদের ইতিহাস

২.দ্বিতীয় তরঙ্গ (১৯৬০ থেকে ১৯৮০-এর দশক):দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'উইমেনস লিবারেশন মুভমেন্ট' হিসেবে এটি পরিচিতি পায়। এই সময় বিতর্ক কেবল ভোটাধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সংস্কৃতি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 'পার্সোনাল ইজ পলিটিক্যাল' (ব্যক্তিগত বিষয়ও রাজনৈতিক) ধারণার ওপর ভিত্তি করে নারীরা প্রজনন অধিকার (জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভপাতের স্বাধীনতা) এবং কর্মক্ষেত্রে সমান মজুরির দাবি তোলেন।

৩. তৃতীয় তরঙ্গ (১৯৯০-এর দশক থেকে ২০০০-এর দশক) :দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদ মূলত শ্বেতাঙ্গ ও মধ্যবিত্ত নারীদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদ এই শূন্যতা পূরণ করে 'ইন্টারসেকশনালিটি' (Intersecionality) বা ছেদক ধারণার ওপর জোর দেয়। এ সময় জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সব ধরনের বৈষম্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং নারীদের নিজস্ব শরীরের ওপর অধিকার ও সমকামী অধিকারের মতো বিষয়গুলো যুক্ত হয়। সহজে বললে[11]—

- ✓ **বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য:** নারীদের কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচে না ফেলে, তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- ✓ **ইন্টারসেকশনালিলিটি বা ছেদক তত্ত্ব:** কৃষ্ণাঙ্গ, প্রান্তিক, এবং এলজিবিটিকিউ (LGBTQ+) নারীদের অভিজ্ঞতাকে নারীবাদের মূল স্রোতে যুক্ত করা হয়।
- ✓ **যৌনতা ও উপস্থাপন:** যৌন ইতিবাচকতা (Sex-positivity) এবং নারীর নিজের শরীরের উপর অধিকারের বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

৪. চতুর্থ তরঙ্গ(২০১০-এর দশক - বর্তমান):ডিজিটাল যুগে এসে সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির হাত ধরে এই ধারার বিকাশ ঘটে।[12]

- ✓ **ডিজিটাল অ্যাক্টিভিজম:** ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নারীবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা, যেমন- হ্যাশট্যাগ মুভমেন্ট।
- ✓ **যৌন সহিংসতা প্রতিরোধ:** কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, যা '#MeToo' আন্দোলনের মাধ্যমে প্রমাণিত।

---

11 কালে কালে নারীবাদের ঢেউ—প্রথম আলো

12 A brief History of feminist waves —blog

- ✓ **অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমার রাজনীতি:** পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর পাশাপাশি লিঙ্গবৈষম্য, বডি শেমিং ও অবাস্তব শারীরিক মানদণ্ডের কঠোর সমালোচনা করা হয়।

নারীবাদের প্রয়োজনীয়তা কেনো দেখা দিয়েছিল?

তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের চরম বৈষম্য, নারীর দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে অবস্থান এবং তাদের মৌলিক অধিকার (ভোটাধিকার, শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকার) ও মানবাধিকার হরণের প্রতিবাদ থেকেই নারীবাদের প্রয়োজন দেখা দেয়।১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই মূলত নারীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও আন্দোলনের সুচনা হয় কালি ও কলম। তৎকালীন প্রেক্ষাপটের প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো[13]:

- ✓ **আইনি ও ভোটাধিকারের অভাব:** তৎকালীন সময়ে নারীদের কোনো ভোটাধিকার ছিল না। রাষ্ট্র পরিচালনায় বা আইন প্রণয়নে নারীদের কোনো মত প্রকাশের সুযোগ ছিল না।
- ✓ **সম্পত্তির অধিকার না থাকা:** বিয়ের পর নারীর উপার্জিত অর্থ ও পৈতৃক সম্পত্তির ওপর স্বামীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকত, নারীর নিজস্ব কোনো আইনি সত্ত্বা ছিল না।
- ✓ **শিক্ষার সীমাবদ্ধতা:** নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল না। তাদের শুধুমাত্র গৃহস্থালি কাজ ও সন্তান পালনের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা হতো।
- ✓ **গৃহস্থালির শ্রমের অবমূল্যায়ন:** শিল্প বিপ্লবের সময়ে পুরুষরা বাইরে কাজ করে মজুরি পেলেও, নারীদের গৃহস্থালি কাজকে অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হতো না, যার ফলে তারা পুরুষদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়তেন।
- ✓ **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য:** সমাজ ও পরিবারে নারীকে পুরুষের অধীনস্ত ও দুর্বল মনে করা হতো এবং তাদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হতো।

13 নারীবাদ – বাংলাপিডিয়া

অর্থাৎ, প্রথম তরঙ্গের তথা শুরুর দিকে নারীবাদের দাবি ও কার্যক্রম গুলোকে যৌক্তিক বলা গেলেও২য় থেকে বর্তমান প্রজন্মের নারীবাদের দাবি ও কার্যক্রম সমূহের অধিকাংশই অযৌক্তিক এবং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ বিরোধী।

নারীবাদের প্রধান ধারা ও তত্ত্বসমহ:

তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে এর বেশ কয়েকটি প্রধান ধারা রয়েছে—

১. উদারপন্থী নারীবাদ (Liberal Feminism):

উদারনৈতিক নারীবাদ হলো নারীবাদী চিন্তাধারার একটি মূলধারার শাখা, যা রাজনৈতিক, আইনি এবং সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা অর্জনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি ব্যবস্থা উৎখাতের পক্ষে ওকালতি না করে, বরং বিদ্যমান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোর মধ্যেই কাজ করে এবং নারীর জন্য ব্যক্তিগত অধিকার, সমান সুযোগ ও স্বায়ত্তশাসনের উপর গুরুত্বারোপ করে।[14]

মূল বিশ্বাস এবং লক্ষ্য

- **ব্যবস্থা সংস্কার:** এটি পিতৃতন্ত্রকে একটি অটল ব্যবস্থা হিসেবে নয়, বরং বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা এবং সেকেলে সামাজিক রীতিনীতির একটি সমষ্টি হিসেবে দেখে, যা আইন ও নীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে।
- **ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন:** এটি এই বিষয়ের উপর জোর দেয় যে নারীরা যুক্তিবাদী সত্তা এবং পুরুষের মতোই হুবহু একই অধিকার, স্বাধীনতা ও সুযোগ পাওয়ার অধিকারী।
- **সমানাধিকারের পক্ষে ওকালতি:** এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে লিঙ্গভিত্তিক বেতন বৈষম্য দূর করা, প্রজনন অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষার সুযোগ উন্নত করা এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য ও হয়রানি-বিরোধী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।

২. উগ্রবাদী বা বৈপ্লবিক নারীবাদ (Radical Feminism):

নারীবাদী আন্দোলনের একটি মৌলিক শাখা, যা পিতৃতন্ত্রকে—পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের একটি ব্যবস্থা—নারীর নিপীড়নের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে । এর যুক্তি

14 Liberal Feminism —Wikipwdia

হলো, লিঙ্গবৈষম্য সামাজিক কাঠামোর গভীরে প্রোথিত এবং এর জন্য শুধু আইনি সংস্কার নয়, বরং সমাজের একটি মৌলিক পুনর্গঠন প্রয়োজন।[15]

১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে নারীবাদ আন্দোলনের 'দ্বিতীয় তরঙ্গ'-এর সময় এই আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে, যা মূলত উদারপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী গোষ্ঠীগুলো থেকে বিভক্ত হয়ে গঠিত হয়েছিল। এই মতাদর্শকে রূপদানকারী প্রধান তাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্যতম, শুলামিথ ফায়ারস্টোন তার বিখ্যাত বই, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution" (১৯৭০) [16]এ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, "নারী নিপীড়নের মূল কারণ হলো নারীর জৈবিক সন্তান জন্মদানের ভূমিকা এবং নারীদের প্রজনন শ্রম থেকে মুক্ত করার জন্য একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছিলেন।" এছাড়াও, কেট মিলেত সেক্সুয়াল পলিটিক্স'[17] গ্রন্থের লেখিকা , তাঁর পিএইচডি থিসিসের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত বই "Sexual Politics" (১৯৭০) এ তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে," পিতৃতন্ত্র জনজীবন ও ব্যক্তিগত জীবন উভয় ক্ষেত্রেই গভীরভাবে প্রোথিত, যা মতাদর্শ এবং পুরুষের শারীরিক শক্তি দ্বারা টিকিয়ে রাখা হয়।" এছাড়াও, তিনি এই বইয়ে প্রথমবার দেখান কীভাবে রাজনীতি কেবল সংসদ বা সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঘরের ভেতরে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যেও বিদ্যমান (ব্যক্তিগত জীবনই রাজনৈতিক)। সাহিত্য ও সমাজে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শ কীভাবে নারীকে দমিয়ে রাখে, তিনি তার ব্যবচ্ছেদ করেন।

মূল বিশ্বাস

- **মূল কারণ হিসেবে পিতৃতন্ত্র:** উগ্র নারীবাদীরা পুরুষ আধিপত্যকে নিপীড়নের সবচেয়ে মৌলিক রূপ হিসেবে দেখেন, যা লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং ক্ষমতা নির্ধারণ করে।
- **ব্যবস্থাগত পুনর্গঠন:** উদারনৈতিক নারীবাদ যেখানে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নারীর সমতার পক্ষে কথা বলে, তার বিপরীতে উগ্রপন্থী নারীবাদ যুক্তি দেয় যে বর্তমান ব্যবস্থাটি জন্মগতভাবেই ত্রুটিপূর্ণ এবং এর সংস্কার সম্ভব নয়।

15 What is feminism —thoughtco

16 Ectogenesis as a Theme in The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution (1970), by Shulamith Firestone

17 Sexual Politics —Kate Millett

- **লিঙ্গ ভূমিকার সমালোচনা:** উগ্র নারীবাদীরা বিশ্লেষণ করেন, কীভাবে সমাজ পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য লিঙ্গ ভূমিকা নির্মাণ ও বলবৎ করে। তারা প্রায়শই 'লিঙ্গ' ধারণাটিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করার পক্ষে মত দেন।
- **পুরুষতান্ত্রিক সহিংসতার উপর গুরুত্বারোপ:** এই আন্দোলনটি নারীর বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক সহিংসতা নির্মূল করার উপর বিশেষভাবে জোর দেয়, যার মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ, গার্হস্থ্য নির্যাতন, যৌন হয়রানি এবং পর্নোগ্রাফি ও পতিতাবৃত্তি শিল্প।

৩. মার্ক্সবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ বা Marxist / socialist feminism:

মার্ক্সবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর নিপীড়ন বিশ্লেষণ করে। মার্ক্সবাদী ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা যুক্তি দেন যে, লিঙ্গবৈষম্য পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত। তাদের মতে, প্রকৃত মুক্তির জন্য পিতৃতন্ত্র ও পুঁজিবাদ[18] উভয়েরই অবসান প্রয়োজন এবং তারা বিশেষভাবে এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন যে, কীভাবে অবৈতনিক গার্হস্থ্য শ্রম ও নারীর দেহের শোষণ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে টিকিয়ে রাখে।

মূল ধারণা ও তত্ত্বসমূহ[19]

- **সামাজিক পুনরুৎপাদন:** এই মূল ধারণাটি হলো যে, পুঁজিবাদ শ্রমশক্তিকে টিকিয়ে রাখতে ও পুনরুৎপাদন করতে নারীদের দ্বারা সম্পাদিত অবৈতনিক ও অবমূল্যায়িত শ্রমের—যেমন সন্তান লালন-পালন, রান্না এবং মানসিক যত্ন—ওপর নির্ভর করে।
- **দ্বৈত ব্যবস্থা তত্ত্ব:** সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা প্রায়শই যুক্তি দেন যে পুঁজিবাদ এবং পিতৃতন্ত্র দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু পরস্পরকে শক্তিশালীকারী নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা।
- **লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন:** অর্থনৈতিক কাঠামো নারীদের জন্য স্বতন্ত্র, প্রায়শই কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্ধারণ করে, যা মার্ক্সবাদী নারীবাদীরা রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন।

মার্ক্সবাদী বনাম সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ :

18 পুঁজিবাদ হল একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা ব্যক্তিগত মালিকানা, উৎপাদনের উপায়ের নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের জন্য তাদের পরিচালনার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ মালিকদের কাছে থাকে এবং এতে রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

19 Marxist and socialist feminism , Written by Camille Cottais ,Translated by Matilde Fourey

- **মার্ক্সবাদী নারীবাদ:** নারী নিপীড়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কঠোরভাবে শ্রেণি ও পুঁজিবাদের উপর আলোকপাত করে । এর দাবি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্থানের মধ্য দিয়ে নারীর পরাধীনতা শুরু হয়েছিল এবং এর সমাধান কেবল একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সম্ভব।
- **সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ:** এটি একটি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং যুক্তি দেয় যে পুঁজিবাদ ও পুরুষ আধিপত্য (পিতৃতন্ত্র) উভয়কেই একযোগে মোকাবেলা করতে হবে। এটি প্রায়শই উগ্র নারীবাদ থেকে প্রাপ্ত অন্তর্দৃষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং পরীক্ষা করে দেখে যে কীভাবে সামাজিকীকরণ ও পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার গতিপ্রকৃতি অর্থনৈতিক শ্রেণি থেকে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান থাকে।

৪. উত্তরাধুনিক নারীবাদ বা Postmodern Feminism :

উত্তরাধুনিক নারীবাদ হলো নারীবাদের এমন একটি শাখা, যা সার্বজনীন বা নির্দিষ্ট কোনো 'নারী সত্ত্বা' বা 'পুরুষ সত্ত্বা'র ধারণার বিরোধিতা করে। এটি ঐতিহ্যবাহী নারীবাদী তত্ত্বগুলোর সীমাবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং লিঙ্গ (gender), ক্ষমতা ও পরিচিতিকে সামাজিক নির্মাণ হিসেবে বিবেচনা করে। [20]

জুডিথ বাটলার তাঁর **১৯৯০** সালের প্রভাবশালী গ্রন্থ ‘জেন্ডার ট্রাবল’ জেন্ডার পারফরমেটিভিটি বা লিঙ্গীয় ক্রিয়াকলাপের ধারণাটি প্রবর্তন করে—এই ধারণা যে, "লিঙ্গ কোনো স্থিতিশীল পরিচয় নয়, বরং এটি এমন এক পরিচয় যা ঐতিহাসিকভাবে এর ফলাফল হিসেবে বিবেচিত পুনরাবৃত্ত অভিব্যক্তি ও কার্যকলাপের দ্বারা গঠিত।"

মূল বৈশিষ্ট্য

- **সার্বজনীনতার বিরোধিতা:** আগের নারীবাদী ধারাগুলো (যেমন উদারপন্থী বা উগ্রপন্থী) ‘সব নারী একই রকম’ এমন একটি সার্বজনীন ধারণার ওপর ভিত্তি করে চলতো। উত্তরাধুনিক নারীবাদ এই ধারণার বিরোধিতা করে এবং বিশ্বাস করে যে, জাতি, ধর্ম, শ্রেণি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিটি নারীর অভিজ্ঞতা ভিন্ন।
- **লিঙ্গ বা জেন্ডার একটি সামাজিক নির্মাণ:** এই তত্ত্ব অনুযায়ী, যৌনতা (Sex) এবং লিঙ্গ (Gender) উভয়েই ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সামাজিকভাবে তৈরি হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ‘নারীসুলভ’ বা ‘পুরুষসুলভ’ বলে যে আচরণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি করেছে, তা প্রাকৃতিক নয়।

---

20 Wikipedia : postmodern feminism

- **ক্ষমতা ও ভাষার সম্পর্ক:** মিশেল ফুকো এবং জাক লাঁকার দর্শনের ওপর ভিত্তি করে এরা মনে করেন, সমাজের ভাষা ও চিন্তাভাবনা (ডিসকোর্স) পুরুষতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তাই ভাষা বিশ্লেষণ ও সংস্কারের মাধ্যমে এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব।

নারীবাদের সমালোচনা :

- **উগ্রপন্থা বা মিসঅ্যান্ড্রি:** কিছু উগ্রবাদী মতাদর্শ পুরুষদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ায়, যা সমাজে লিঙ্গযুদ্ধ বা পুরুষদের অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করে।
- **পরিবার প্রথাকে অবমূল্যায়ন:** কোনো কোনো সমালোচকের মতে, উগ্র নারীবাদ মাতৃত্ব এবং গৃহস্থালি কাজকে অবমূল্যায়ন করে, যা পারিবারিক কাঠামো ও সমাজব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
- **সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব:** অনেক সমাজ ও ধর্মে নারীবাদকে পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসন হিসেবে দেখা হয়, যা স্থানীয় ঐতিহ্য ও পারিবারিক অনুশাসনের সাথে সাংঘর্ষিক।
- **শ্রেণীর বৈষম্য:** শুরুর দিকের নারীবাদ মূলত সুবিধাভোগী ও শ্বেতাঙ্গ নারীদের সমস্যাকে বেশি ফোকাস করেছিল, যা প্রান্তিক ও শ্রমজীবী নারীদের সমস্যাকে আড়াল করেছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন।

নারীবাদ সমাজের প্রতিটি মানুষের জন্য একটি ন্যায্য ও বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়ার পক্ষে কথা বলে। তবে এর প্রয়োগ এবং মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে এটি বারবার বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে।

নারীবাদের সফলতা ও বাস্তবতা:

নারীবাদের প্রথম দিকে যেই সফলতা গুলো অর্জিত হয়েছিল, যেমন ভোটাধিকার, কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্য, পুরুষ কতৃপক্ষের স্বাক্ষর ব্যাতীত ব্যাংক একাউন্ট খোলার অনুমতি ইত্যাদি সফলতাগুলো ছিল যৌক্তিক। কিন্তু পোশাকের স্বাধীনতা, ইন্টারসেকশনালিটি, দেহের স্বাধীনতা (My body my choice) নামক এই দাবিগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সরূপ সমাজের অতিস্থিশীলতা, পারিবারিক দ্বন্দ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মতো বাস্তবতা গুলো এড়িয়ে যাবার মতো নয়। ফলস্বরূপ, এসবেরই ধারাবাহিকতায় নারীবাদ এখন হয়ে উঠেছে নারীর আর্তনাদেরই কারণ। এ ব্যাপারে উম্মে খালিদ রচিত "একজন নারীবাদীর জবানবন্দিতে নারীবাদের আর্তনাদ"

বইয়ে একজন প্রাক্তন নারীবাদির অভিজ্ঞতার বর্ণনায় নারীবাদের কিছু বাস্তব সত্য উঠে এসেছে। উঠে এসেছে নারীবাদ কিভাবে নারীরই বিরোধী, তার প্রমাণ। নারীবাদ প্রকৃতপক্ষে নারীর অধিকারে নিয়োজিত নয় বরং নারীদের প্রকৃত সুখ ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কাজগুলো অত্যন্ত সুক্ষ্ম ভাবে করে চলেছে, যুগের পর যুগ ধরে।

- ❖ একুশ শতকে এসে যেই ধারণাটি নারীবাদ সফলভাবে সারাবিশ্বে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, তা হলো ইসলাম নারীদের স্বাধীনতা সীমিত করেছে। কিন্তু কোনো মতবাদকে মূল্যায়ন করতে হলে তার আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সামাজিক বাস্তবতা জানা প্রয়োজন। তাছাড়া আজকের মানবাধিকার ও নারী অধিকার ধারণাকে সপ্তম শতাব্দীর সমাজের উপর সরাসরি বসিয়ে বিচার করলে ইতিহাসের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। বরং দেখতে হবে, ইসলাম যেই সমাজে এসেছে সেখানে নারীদের অবস্থান কী ছিল এবং ইসলাম সেই অবস্থার কী পরিবর্তন এনেছে।
- ❖ ইসলাম কি সত্যিই নারীদের পিছিয়ে দিয়েছে, নাকি ইসলাম আগমনের পূর্বে নারীদের বাস্তব অবস্থার সাথে তুলনা না করেই এ অভিযোগ করা হয়? ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, পৃথিবীর বহু সভ্যতায় নারী ছিল অবহেলিত, অধিকারবঞ্চিত ও অনেক ক্ষেত্রে মানবিক মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের আগমন নারীর অবস্থানে কী পরিবর্তন এনেছিল, তা বোঝা জরুরি।

তারই প্রেক্ষাপটে, তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামের আগমের পূর্বে বিভিন্ন সমজে নারীর প্রতি কি ধরণের আচরণ করা হয়েছিল, এবং ইসলাম ব্যাতীত পূর্বে ও বর্তমানে নারীদের কে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয় সেই বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

তৃতীয় অধ্যায়

~ইসলামের আবির্ভাব-পূর্ব প্রেক্ষাপট~

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”

— সূরা আর-রূম ৩০:২১

আল্লাহ তাআলার এই বাণী মানবসমাজে নারীকে কেবল একটি সামাজিক পরিচয় নয়, বরং শান্তি, ভালোবাসা ও মানবিক মর্যাদার আধার হিসেবে উপস্থাপন করে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এমন এক সময়ও পৃথিবীতে অতিবাহিত হয়েছে যখন নারীরা ছিল অবহেলিত, অধিকারবঞ্চিত ও সমাজের প্রান্তিক এক সত্তা।

বর্তমান নারীবাদ সমাজে দাবি করা হয় যে ইসলাম নারীদের পিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের নিরপেক্ষ পাঠ আমাদের সামনে ভিন্ন বাস্তবতা তুলে ধরে। যে সময়ে নারী ন্যূনতম মানবিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল, সে সময় ইসলামই নারীকে সম্মান, উত্তরাধিকার, নিরাপত্তা ও ব্যক্তিসত্তার অধিকার প্রদান করে। তাই ইসলামের অবস্থান বুঝতে হলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন ইসলাম-পূর্ব সমাজে নারীদের প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল। এই অধ্যায়ে সেই ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও ইসলামের পরিবর্তনধর্মী ভূমিকা আলোচিত হবে।

১. জাহেলী আরব সমাজে নারীঃ

সপ্তম শতাব্দীর আরব সমাজ, যাকে ইতিহাসে “আইয়ামে জাহেলিয়াত” বলা হয় তা ছিল নৈতিক অবক্ষয় ও বৈষম্যে পরিপূর্ণ। পবিত্র ক‍ুরআন সেই নির্মম বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে বলেছে—

“*যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যায় এবং সে দুঃখে ভারাক্রান্ত থাকে।”*

— সূরা আন-নাহল ১৬:৫৮

সমাজে নারীর অবস্থা: জাহেলিয়া যুগে সমাজে নারীর অবস্থা ছিল অতি নিম্নে। নারীদেরকে সে সমাজে পণ্যদ্রব্য এবং ভোগের সামগ্রী হিসেবে মনে করা হতো। তাদের আর্থসামাজিক, সম্পত্তি ভোগের কোন মর্যাদা ছিল না বলে পতিতাবৃত্তি সমাজে স্বীকৃতি পায়। নারীরা সর্বত্র পুরুষদের দ্বারা নিগৃহীত হতো।

তবে কিছু অভিজাত পরিবারের নারীরা কিছুটা স্বাধীনতা ও মর্যাদা পেত, যেমন হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন একজন সফল বণিক।

বিবাহ প্রথা: ইসলাম পূর্ব যুগে বিবাহ প্রথায় সুনির্দিষ্ট কোন রীতি ছিল না। পুরুষরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, ইচ্ছামতো বর্জন, অবৈধ প্রণয় এবং বহু রক্ষিতা রাখত। তেমনি নারীরাও একাধিক স্বামী বা বহুপতি গ্রহণ ও ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। শুধু তাই নয় ভাইবোন বিয়ে ও বিধবা মাতাকে বিয়ে করার কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। পতিতাবৃত্তিও চালু ছিল।

উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা: নারীরা পিতার বা স্বামীর সম্পত্তিতে কোনো উত্তরাধিকার পেত না। এমনকি পিতার মৃত্যুর পর সন্তানরা তাদের সৎ মাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেত এবং ইচ্ছা করলে তাদের বিয়ে করত বা অন্যের কাছে বিক্রি করে দিত।

কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দান: প্রাক-ইসলামি যুগে কন্যা সন্তান জন্মদান অভিশাপ হিসেবে বিবেচিত হতো। দারিদ্র্যের কারণে বড় হলে ব্যভিচারিনী বা শত্রু গোত্রের দ্বারা লুন্ঠিত বা অপহৃত হওয়ার ভয়ে তারা নবজাতক কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। এ ঘৃণার প্রথা উচ্ছেদ করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন —

দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক (জীবিকা) দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।" — সূরা বনি ইসরাইল– ৩১

২. প্রাচীন গ্রীসে নারীর অবস্থা :

প্রাচীন গ্রীস সভ্যতাকে মানব ইতিহাসে জ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হলেও নারীদের সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত সীমিত ও বৈষম্যমূলক। সমাজব্যবস্থা মূলত পুরুষকেন্দ্রিক ছিল এবং নারীদের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তে পরিবার ও পুরুষের অধীনস্থ হিসেবেই দেখা হতো। নারীকে একান্ত অর্থহীন দ্রব্য হিসেবে বদ্ধ ঘরে সীমাবদ্ধ করে রাখা হতো। এমনকি বড় বড় গ্রিন দার্শনিক এবং

চিন্তাবিদরাও মনে করতেন যে, নারী অস্তিত্বের মতো নারী নামটাকেও যেন বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়।[21] কিছু বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকও নারীদের নিম্নতর অবস্থানে দেখতেন। যেমন এরিস্টটল নারীদেরকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল ও অধীনস্থ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। এর ফলে সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব আরও শক্তিশালী হয়। এথেন্স নগররাষ্ট্রে নারীদের চলাফেরা ও সামাজিক মেলামেশার উপর নানা বিধিনিষেধ ছিল। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা' এ কথাটি ছিল গ্রিকদের জন্যে একান্ত দুর্বোধ্য কথা। অবশ্য প্রেম ভালোবাসার জন্যে তাদের আলাদা ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যাপারে চমৎকার চিত্রাঙ্কন করেছেন প্রখ্যাত গ্রিক চিন্তাবিদ ডেমোস্থিন। তিনি বলেন : "আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জনের জন্যে বেশ্যালয়ে যাই এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচি তৈরি করে থাকে বালিকা বন্ধুরাই আর আমরা কেবল আইনগতভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যেই স্ত্রী গ্রহণ করি।" এ জন্যে বিয়ের পর মেয়েরা পিতৃকূল ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসে; কিন্তু তা এজন্যে নয় যে, সে স্বামীর ঘরের কর্ত্রী হবে। তা নয়; বরং স্বামীর ঘরে তাকে আসতে হয় শুধু সে সেবিকার দায়িত্ব পালন এবং সন্তান উৎপাদন ও তার লালন-পালনের জন্যেই।[22]

যদিও স্পার্টার মতো কিছু অঞ্চলে নারীরা তুলনামূলক কিছু স্বাধীনতা ভোগ করত, তবুও সামগ্রিকভাবে প্রাচীন গ্রীক সমাজ ছিল পুরুষতান্ত্রিক ও নারীনির্ভর কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত।

৩. প্রাচীন রোমে নারীর অবস্থা:

রোমান সভ্যতাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। সেখানে পরিবারের প্রাচীন পুরুষই ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরু; সব সম্পদ, ক্ষমতা এবং অধিকারের একচ্ছত্র মালিক হতো সেই। সব রকমের বেচা-কেনা, মামলা, চুক্তি ইত্যাদি তারই আয়ত্তাধীন ছিল। রোমান সমাজে নারীর কোনো গুরুত্ব, অধিকার বা মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। কোনো রকমের আইনগত অধিকার থেকেও নারী ছিল বঞ্চিত। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু আর পাগলের মতো নারীকেও মনে করা হতো অযোগ্য ও অক্ষম। নারী হয়ে জন্মে নেওয়াই ছিল তার অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমনকি যা বাবার

21 গ্রিক ইতিহাস, ১১৪-১১৭ পৃষ্ঠা

22 ইসলামে নারী, ১৭-১৮ পৃষ্ঠা

কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক বা পিতার হিসেবে পাওয়া সম্পত্তিতেও নারীর কোনো অধিকার ছিল না। স্বামীর ঘর করার সাথে সাথে স্ত্রীর সব ব্যক্তিগত সম্পদও স্বামীর মালিকানায় চলে যেতো। রোমান নারী আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল, এমনকি তার সাক্ষী দেওয়ার অধিকার ছিল না। রোমান সমাজে অন্য এক ধরনের বিয়ে-শাদীরও প্রচলন ছিল। এই বিয়েকে 'সর্দারি বিয়ে' বলা হতো। এর মাধ্যমে যেকোনো নারী সর্দারের স্ত্রী বলে গণ্য হতো এবং একবার কেউ সর্দারি বিয়ের কবলে পড়লে তাকে তার সাবেক পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হতো এবং কখনো তার ওপর কোনো অভিযোগ আনা হলে তাকে সর্দারের সামনে পেশ করা হতো যেন নিজ হাতে তার শাস্তি দিতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো সর্দার অভিযুক্ত নারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকারও রাখতো, যেমন বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে। এছাড়া কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে, তার বিধবা স্ত্রী ছেলেদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো, যদি পুত্রসন্তান না থাকতো তাহলে বিধবাটি স্বামীর ছোটভাই বা চাচার অধিকারে চলে যেতো।[23]

৪.প্রাচীন চীনে নারীর অবস্থান:

প্রাচীন চীনা সমাজ ছিল গভীরভাবে পুরুষতান্ত্রিক এবং কনফুসীয়[24] সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত। সেখানে নারীর প্রধান পরিচয় ছিল একজন কন্যা, স্ত্রী বা মাতা হিসেবে; স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে নয়। সমাজে নারীদের জন্য "তিন আনুগত্য" (Three Obediences) নীতি প্রচলিত ছিল, বাল্যকালে পিতার, বিবাহের পর স্বামীর এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের আনুগত্য করা নারীর কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হতো।

নারীদের শিক্ষা, সামাজিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। অধিকাংশ নারী গৃহস্থালি কাজ, সন্তান লালন-পালন এবং পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। বিয়ের ক্ষেত্রেও নারীর ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে পারিবারিক সিদ্ধান্ত বেশি গুরুত্ব পেত।

প্রাচীন চীনে পুত্রসন্তানকে পরিবারের উত্তরাধিকার ও বংশরক্ষাকারী হিসেবে অধিক মূল্য দেওয়া হতো। অন্যদিকে কন্যাসন্তানকে অনেক সময় অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে

23 ইসলামে নারী- পৃষ্ঠা ১৮

24 কনফুসীয় সামাজিক ব্যবস্থা হলো প্রাচীন চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯) আদর্শ ও দর্শনভিত্তিক একটি সামাজিক কাঠামো।

দেখা হতো। সমাজে নারীর মর্যাদা প্রায়ই তার পুরুষ অভিভাবকের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। চীনের ইতিহাসে নারীদের উপর "ফুট বাইন্ডিং" বা পা বেঁধে ছোট রাখার একটি কষ্টদায়ক প্রথাও প্রচলিত ছিল। ছোট পাকে সৌন্দর্য ও উচ্চ সামাজিক মর্যাদার প্রতীক মনে করা হতো। এই প্রথি নারীদের চলাফেরা সীমিত করত এবং তাদের পুরুষনির্ভরতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো।[25]

এভাবে দেখা যায়, প্রাচীন চীনা সভ্যতা জ্ঞান ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হলেও নারীদের পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতা ও সমমর্যাদা সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল না; বরং তারা ছিল একটি পুরুষনিয়ন্ত্রিত সামাজিক কাঠামোর অংশ।

৫. প্রাচীন ভারতে তথা হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থা:

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনু স্মৃতির অধ্যয়নে জানা যায় নারীর প্রতি চরম বৈষম্যের কাহিনী। নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিতা করে রাখা, নারীকে পুরুষের অধীনস্থ করে রাখার সকল উপায় বলে দেওয়া হয়েছে এই মনুসংহিতায়। ভ্রষ্ট পুরুষদের দোষ আড়াল করতে মনু নারীকেই দায়ী করেছেন, "ইহ সংসারে দেহধর্মবশত সব মানুষই কাম ক্রোধের বশীভূত। তাই মূর্খই হোক আর বিদ্বানই হোক কাম ক্রোধের বশীভূত পুরুষদের অনায়াসেই বিপথে নিয়ে যেতে কামিনীরা সমর্থ হয়।" ২/২১৪। অর্থাৎ, নারীই পুরুষকে বিপথে নিয়ে যায়। বলাবাহুল্য হিন্দু সমাজে আজও নারীকে সকল পাপের উৎস মনে করা হয় এবং হিন্দু ধর্মমতে নারীর কোনো অধিকার বা মর্যাদা নেই।[26] তাছাড়া মনু সমাজ বিশ্বাস করে শুধু পুত্র বা ছেলেই স্বর্গ লাভের কারণ হতে পারে, শুধু কারণই নয়, বরং পিতা যদি কোনো কারণে নরকে চলে যায়, সেখান থেকে শুধু পুত্রই পারে পিতাকে স্বর্গে ফিরাতে—[পুত্রের জন্য মানুষ স্বর্গ লাভ করে। পৌত্রের জন্য মানুষ ঐ স্বর্গ লোকে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে এবং পৌত্রের জন্য মানুষ সূর্যলোক লাভ করে। —মনুসংহিতা ৯/১৩৭]। [27]

25 Women in Ancient China

26 বিশ্ব ইতিহাস-৩৯৪

27 মনুর চোখে নারী – হিন্দু ধর্মে নারীর দুরবস্থা

তাছাড়া, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সতীদাহ প্রথার মতো নিকৃষ্ট কুসংস্কারগুলোর ব্যপারে কে না জানে! এমনকি হিন্দু ধর্মে বিধবা দের আমীষ খাওয়াও, সাজ-সজ্জা করাও বারণ ছিল।

৬. খ্রিস্ট ধর্মে নারীর অবস্থান :

বাইবেলের আদিপুস্তক (জেনেসিস)-এর কাহিনী অনুসারে প্রথম মানব আদমকে নিষিদ্ধ ফল খেতে প্রলুব্ধ করার দায়ে হাওয়া (ইভ)-কে দোষারোপ করা হতো। এই ধারণাকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগীয় অনেক ধর্মতাত্ত্বিক নারীদেরকে 'শয়তানের প্রবেশদ্বার' ও পুরুষকে বিপথগামী করার মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করতেন। জনৈক পাদ্রির মতে নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশস্থল। তারা ঈশ্বরের মান-মর্যাদার প্রতিবন্ধক ও মানুষের পক্ষে তারা বিপজ্জনক। পাদ্রি মহোদয় আরোও বলেছেন " নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই উচিৎ। নারী হচ্ছে পুরূষের মনে লালসা উদ্রেককারি, ঘরে ও সমাজে যত অশান্তি সৃষ্টি হয় সব তারই কারণে।"[28] খৃস্টধর্মের প্রভাবে নারীর প্রতি পাশ্চাত্যজগতের আচরণ ছিলো চরম অবমাননামূলক, যা মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। এমনকি ১৮০৫ সাল পর্যন্ত বৃটিশ আইনে স্বামীর অধিকার ছিলো স্ত্রীকে বিক্রি করার। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের পরও নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করার কথা সেখানকার চিন্তানায়কদের মাথায় আসেনি। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ফরাসী নাগরিক আইনে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নারীর অধিকার ছিলো না কোন বিষয়ে কোন পক্ষের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার।

৭. বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান:

বুদ্ধযুগের সমাজব্যবস্থায় নর্তকী ও বারবণিতার ভুরি ভুরি উল্লেখ পাওয়া যায় । পুরুষের আমোদ-প্রমোদের জন্য নারীর ব্যবহার ছিল নৈমিত্তিক বিষয় । পুরুষের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করতেই প্রচুর অর্থের বিনিময়ে নিজেদের জীবনকে ভোগসামগ্রীর মতো ব্যবহার করতে হতো । বিমলাচরণ লাহা দেখিয়েছেন, বৈশালীতে এরকম আইন-ই

28 খৃষ্টীয় ধর্মে নারীর মর্যাদা

হয়তো বা ছিল যে সুন্দরী রমনী বিয়ে করতে পারবে না; জনসাধারণের আনন্দ দান হবে তাঁদের মূল কাজ। আবার যুবতী কন্যারা সবচেয়ে বেশি পণে বিক্রি হতো।[29]

বৌদ্ধ ধর্মে নারীদের অবস্থা অত্যন্ত হীন ও একদেশদর্শিতামূলক বলে চিত্রিত করা হয়েছে। বুদ্ধদেব নারীদের মোহের স্বরূপ ও নির্বাণ লাভের পথে বিঘ্ন হিসেবে গণ্য করতেন, যার ফলে নারীত্ব ও গৃহধর্ম অবহেলিত হয়। বৌদ্ধ সমাজে নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার ছিল সীমিত এবং কন্যা সন্তানের জন্ম অশুভ হিসেবে বিবেচিত হতো, যেখানে নারীদের স্বল্পমূল্যের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো।[30]

৮.ইহুদি ধর্মে নারী:

প্রাচীন ইহুদী সমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মীয় আইন, সামাজিক রীতি এবং রাব্বিনিক ব্যাখ্যায় নারীদেরকে প্রায়ই পুরুষের অধীনস্থ হিসেবে দেখা হতো। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদী আইনে (Halakha) অনেক সময় নারীর সাক্ষ্য আদালতে পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা পেত না, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও পুত্র সন্তান কন্যার তুলনায় অগ্রাধিকার পেত। ধর্মীয় নেতৃত্ব, উপাসনার আনুষ্ঠানিকতা ও তোরাহ শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত ছিল।

তালমুদে এমন কিছু বক্তব্য পাওয়া যায় যেখানে নারীদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, কিছু রাব্বিনিক উক্তিতে নারীদের আবেগপ্রবণ বা কম জ্ঞানসম্পন্ন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইহুদী প্রার্থনার একটি ঐতিহ্যবাহী অংশে পুরুষরা বলত: “ধন্য তুমি, হে প্রভু, তুমি আমাকে নারী হিসেবে সৃষ্টি করোনি।” অন্যদিকে নারীদের জন্য নির্ধারিত বাক্য ছিল: “ধন্য তুমি, যিনি আমাকে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছ।” সমালোচকদের মতে, এটি নারীকে পুরুষের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে দেখানোর ইঙ্গিত বহন করে।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবনেও পুরুষের কর্তৃত্ব বেশি ছিল। প্রাচীন ইহুদী আইনে স্বামীই তালাক দেওয়ার মূল অধিকার রাখত, এবং স্ত্রী অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিছু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় দেখা যায়, নারীদেরকে প্রধানত সন্তান জন্মদান ও গৃহস্থালির দায়িত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হতো।[31]

---

29 বুদ্ধের নারী ও বৌদ্ধ নারীর সমাজতত্ত্ব // নিখিল নীল

30 ইসলামে নারী, পৃষ্ঠা ২০

31 Women : In Judaism

প্রাচীন আরব, গ্রীস, রোম, ভারত ও চীনের মতো বহু সভ্যতায় এবং বিভিন্ন ধর্মীয়-সামাজিক ব্যবস্থায় নারীকে প্রায়ই দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হিসেবে দেখা হতো। কোথাও তাকে ভোগের বস্তু, কোথাও সম্পত্তি, আবার কোথাও পুরুষের অধীন এক নিঃশব্দ সত্তা হিসেবে গণ্য করা হতো। শিক্ষা, উত্তরাধিকার, স্বাধীন মতপ্রকাশ কিংবা সামাজিক মর্যাদা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী ছিল বঞ্চিত। এমনকি কিছু সমাজে কন্যাসন্তানের জন্মকে অভিশাপ মনে করে নির্মম আচরণও করা হতো।

এই অন্ধকার বাস্তবতার মাঝেই ইসলাম আবির্ভূত হয়ে নারীর মর্যাদাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম ঘোষণা করে যে নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানবিক মর্যাদায় সমান।

পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

চতুর্থ অধ্যায়

জাহেলিয়াত থেকে মর্যাদায়ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَـٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

"আমি আদাম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদের জন্য জলে স্থলে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে পবিত্র রিযক দিয়েছি আর আমি তাদেরকে আমার অধিকাংশ সৃষ্টির উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" —সূরা আল ইসরা-৭০

~জাহেলিয়াত থেকে মর্যাদায়: ইসলামের নারীভাবনা~

জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত এক পৃথিবীতে, যখন নারী ছিল অবহেলা, বৈষম্য ও নিপীড়নের প্রতীক, তখনই ইসলাম রহমত হয়ে আবির্ভূত হয়। যে সমাজে কন্যাসন্তানের জন্মকে লজ্জা মনে করা হতো, নারীর মতামতের মূল্য ছিল না এবং তাকে শুধুই ভোগ্যবস্তু বা সম্পত্তি হিসেবে দেখা হতো, সেই সমাজেই ইসলাম নারীর

মর্যাদা, অধিকার ও মানবিক সম্মান প্রতিষ্ঠা করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে। জাহেলি আরবে যখন, কন্যা সন্তান জন্মালে ভ্রু কুঞ্চিত করতো, কন্যা সন্তানকে অপ্রয়োজনীয় ও দুর্ভাগ্যে কারণ মনে করতো তখনই আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল তাদের কে সতর্কতাবানী সরূপ সূরা নাহলে বলেন,

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখে-কষ্টে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে সুসংবাদটি গোপন করার জন্য নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছ থেকে আত্মগোপন করে। সে ভাবে, হীনতা সত্ত্বেও কি তাকে রেখে দেবে, নাকি তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে! সাবধান! তাদের সিদ্ধান্ত কতই না নিকৃষ্ট।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯)

এছাড়াও, পাপহীন নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিনের কঠোর জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে, সূরা আত-তাকভীর (আয়াত: ৮-৯):

"আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে—কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?" —(সূরা আত তাকভীর;৮-৯)

শুধু তাই নয়, আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাবে কেরআনে বর্ণনা করেছেন, কন্যা সন্তান দান একমাত্র তারই এখতিয়ার।

"আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক আল্লাহ। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন; তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন।" (সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪৯)

এসত্ত্বেও, জাহেলিয়াত তৎকালীন সমাজের পুরুষদের কি পরিমাণ অন্ধ করে রেখেছিলো, যে তারা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার নিয়ামত কে অস্বীকার করছে, তবুও সে ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত ছিল না!

শুধু তাই নয়, ইসলাম মা'কে দিয়েছে সর্বোচ্চ অধিকার ও মর্যাদা। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে,

'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। তাঁদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদের উফ্ (বিরক্তিও অবজ্ঞামূলক কথা) বলবে না এবং তাঁদের ধমক দেবে না; তাঁদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবশে তাঁদের প্রতি নম্রতার ডানা প্রসারিত করো এবং বলো, "হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি

দয়া করো, যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।'" (সুরা ইসরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ২৩-২৪)।

এমনকি, সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা, একজন গর্ভধারিণী মা'য়ের গর্ভকালীন সময়ের কষ্টগুলোকেও কোরআনে সুন্দরভা*বে ফুটিয়ে তুলেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে; সুতরাং আমার (আল্লাহর) প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।' (সুরা লুকমান, আয়াত: ১৪)।*

আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অন্যত্র বলেছেন,

'আর আমি (আল্লাহ) মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করে; তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছেন ও অতিকষ্টে প্রসব করেছেন এবং লালন-পালন করেছেন।' (সুরা আহকাফ, আয়াত: ১৫)।

এছাড়াও, রব্বে আরশে আযীম এর কাছে পিতা- মাতার সম্মান কতটুকু তা বুঝাতে এবং সন্তান যেন কখনোও তাদের অবাধ্য না হয় রবং সম্মানের সাথে আচরণ প্রদর্শন করে, সেটিও স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন—

"তোমার পালনকর্তা আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।"(সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩)

আল্লাহর কাছে যদি নারীর সম্মান না ই থাকতো, তাহলে তিনি শুধু পিতাকেই উল্লেখ করতেন, কিন্তু পিতা- মাতা দু'জনকেই উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো আয়াতে দু'জনকে সহাবস্থানে রেখেছেন, আবার কখনোওবাা মাকে/ কন্যা সন্তানকে/ নারীকে পুরুষের চেয়েও সম্মানিত করেছেন কিন্তু কখনোও অসম্মান বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন নি।

- ❖ ইসলাম নারীকে কিভাবে সম্মানিত করেছে, তা আরো বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ((ﷺএর কিছু হাদিস থেকেঃ

1. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কেয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)'। (মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩১, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯১৪, মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১২০৮৯, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস নং: ২৫৯৪৮)
2. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলনে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করনে, 'যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, অতঃপর সে ওই কন্যাকে কষ্ট দেয়নি, মেয়ের ওপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রধান্য দেয়নি, তাহলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ' (মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১/২২৩)
3. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুহাম্মদ ইবন ইউনূসের বর্ণনায় এ হাদীসে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে এসেছে) একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসুল, যদি দু'জন হয়? উত্তরে তিনি বললেন, দু'জন হলেও। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, যদি একজন হয় হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, একজন হলেও। ' (বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান : ৮৩১১)
4. আউফ বিন মালেক আশজায়ি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ''যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে রয়েছে, যাদের ওপর সে অর্থ খরচ করে বিয়ে দেওয়া অথবা মৃত্যু পর্যন্ত, তবে তারা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে। তখন এক নারী বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আর দুই মেয়ে হলে? তিনি বললেন, দুই মেয়ে হলেও। ' -(বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং : ৮৩১৩)
5. হযরত আবদুল্লাহ উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'ওই নারী বরকতময়ী ও সৌভাগ্যবান, যার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়। কেননা, (সন্তানদানের নেয়ামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) আল্লাহ তায়ালা মেয়েকে আগে উল্লেখ করে বলেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। ' -(কানযুল উম্মাল ১৬:৬১১)

6. হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি দু’টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কেয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু’টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)’। (মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩১, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯১৪, মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১২০৮৯, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস নং: ২৫৯৪৮)
7. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলনে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করনে, ‘যার ঘরে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলো, অতঃপর সে ওই কন্যাকে কষ্ট দেয়নি, মেয়ের ওপর অসন্তুষ্টও হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে তার ওপর প্রধান্য দেয়নি, তাহলে ওই কন্যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ’ (মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১/২২৩)
8. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুহাম্মদ ইবন ইউনূসের বর্ণনায় এ হাদীসে অতিরিক্ত অংশ হিসেবে এসেছে) একব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসুল, যদি দু’জন হয়? উত্তরে তিনি বললেন, দু’জন হলেও। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, যদি একজন হয় হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, একজন হলেও। ’ (বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান : ৮৩১১)
9. আউফ বিন মালেক আশজায়ি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে রয়েছে, যাদের ওপর সে অর্থ খরচ করে বিয়ে দেওয়া অথবা মৃত্যু পর্যন্ত, তবে তারা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে। তখন এক নারী বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আর দুই মেয়ে হলে? তিনি বললেন, দুই মেয়ে হলেও। ’ -(বাইহাকি, শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং : ৮৩১৩)
10. হযরত আবদুল্লাহ উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘ওই নারী বরকতময়ী ও সৌভাগ্যবান, যার প্রথম সন্তান মেয়ে হয়। কেননা, (সন্তানদানের নেয়ামত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে) আল্লাহ তায়ালা মেয়েকে আগে উল্লেখ করে বলেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। ’ -(কানযুল উম্মাল ১৬:৬১১)

11.আয়েশা (রা.) বলেন, ‘আমার কাছে এক নারী এলো। তার সঙ্গে তার দুই মেয়ে। আমার কাছে সে কিছু প্রার্থনা করলো। সে আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না। আমি তাকে সেটি দিয়ে দিলাম। সে তা গ্রহণ করললো এবং তা দুই টুকরো করে তার দুই মেয়ের মাঝে ভাগ করে দিলো। তা থেকে সে নিজে কিছুই খেলোল না। তারপর নারীটি ও তার মেয়ে দু’টি উঠে পড়লো এবং চলে গেলো।

ইত্যবসরে আমার কাছে নবী (সা.) এলেন। আমি তার কাছে ওই নারীর কথা বললাম। নবী (সা.) বললেন, ‘যাকে কন্যা দিয়ে *কোনো কিছুর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয় আর সে তাদের প্রতি যথাযথ আচরণ করে, তবে তা তার জন্য আগুন থেকে রক্ষাকারী হবে। ’ -(মুসলিম, হাদিস নং : ৬৮৬২; মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং : ২৪৬১৬)*

❖ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম((ﷺএর শুধু কন্যা সন্তানের সম্মান নিয়েই ভাবেননি, মা এবং অন্যান্য প্রতিও দেখিয়ে গিয়েছেন সম্মানের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

১. এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহর রাসুল! আমার সুন্দর সাহচর্য বা উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি জিজ্ঞেস করল, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার পিতা।" (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

২. হজরত কাব ইবনে ওজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন (মসজিদে নববির) মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলেন; আর বললেন- ‘আমিন’। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন; আবার বললেন- ‘আমিন'। তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন; আর তখনও বললেন- ‘আমিন’।

হজরত কাব ইবনে ওজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি যখন (মিম্বর থেকে) নামলেন; আমরা তাঁর কাছে 'আমিন' বলার কারণ জানতে চাইলাম। বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! এর আগে তো আপনাকে কখনো এভাবে 'আমিন' বলতে শুনিনি। উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন-

প্রথম সিঁড়িতে পা রাখার সময় হজরত জিবরিল আলাইহিসসালাম বললেন, ‘ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি; যে রমজান মাস পেল, কিন্তু তার গুনাহ মাফ করাতে পারল না।' তখন

আমি বললাম- 'আমিন'। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময় হজরত জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন, 'ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি; যার কাছে আপনার নাম উচ্চারিত হলো অথচ সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।' তখন আমি বললাম- 'আমিন'।

তৃতীয় সিড়িঁতে পা রাখার সময় হজরত জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন, 'ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি যে বৃদ্ধ বাবা-মা উভয়কে অথবা একজনকে পেল অথচ তারা উভয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। অর্থাৎ (সন্তান) তাদের খেদমতের মাধ্যমে নিজেকে জান্নাতবাসী করতে পারল না।আমি বললাম- আমিন।' (মুসলিম, তিরজিমি)।

৩. এক ব্যক্তি নবীজীর স. কাছে এসে বলল, আমি আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশায় আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের ব্যাপারে শপথ করছি। নবীজী স. বললেন, তোমার পিতা-মাতার কোনো একজন জীবীত নাকি? লোকটা বলল,হ্যাঁ, বরং উভয়ই। তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহর কাছে সওয়াব আশা করো। লোকটা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমার পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। - মুসলিম

৪. এক ব্যক্তি নবীজীর স. কাছে এসে জিহাদের জন্য অনুমতি চাইল। নবীজী স. বললেন, তোমার পিতা-মাতা জীবীত নাকি? লোকটা বলল,হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তাদের জন্যই পরিশ্রম করো (এতেই তুমি জিহাদের সওয়াব পাবে)। -বুখারী, মুসলিম

❖ শুধু তাই নয়, স্ত্রী এর হক্কের ব্যাপারেও রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ((ﷺদিয়ে গিয়েছেন উত্তম শিক্ষাঃ

১. হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"মুমিনদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।" (সুনানে তিরমিযী; হা.নং **১১৬২**)

২. স্ত্রী অভদ্র ও বদমেযাজী হলেও ইসলাম স্বামীকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছে এবং প্রতিদান হিসেবে পরকালে স্বামীর জন্য মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে। স্ত্রীর ভালো দিকগুলো নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করতে বলেছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে বলেছে। কারণ অভদ্র হওয়া সত্ত্বেও সে তো স্বামীর খিদমত, রান্না-বান্না, সংসার পরিচালনা ও সন্তানাদি লালন-পালনসহ প্রতিনিয়ত অসংখ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে। অতএব কদাচিৎ তার পক্ষ থেকে কিছুটা কষ্ট পেলে তা সয়ে যাওয়াই স্বামীর কর্তব্য। এক্ষেত্রে লোকমান

হাকীমের একটি ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে। প্রসিদ্ধ আছে যে, লোকমান হাকীম একজন কৃতদাস ছিলেন। একবার তার মুনীব তাকে ভালোবেসে তার জন্য বড় একটি লাল বাঙ্গি নিজ হাতে কাটলেন। তারপর বাঙ্গির টুকরোগুলো তার মুখে তুলে দিচ্ছিলেন। লোকমান হাকীম আনন্দচিত্তে খেয়ে চলছিলেন। মুনীব শেষ টুকরোটি হাতে নিয়ে বললেন, সবগুলো তোমাকে খাওয়ালাম; এটি আমি খাই। তিনি টুকরোটি মুখে নিয়ে সাথে সাথে ফেলে দিলেন। বললেন, বাঙ্গিটি দেখতে এত ভালো অথচ ভেতরে এমন তিতা! তুমি খেলে কিভাবে? লোকমান হাকীম উত্তর দিলেন, আপনার এই হাত থেকে জীবনে কত নেয়ামত লাভ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। আজ না হয় একটু কষ্টই পেয়েছি, তাই বলে তা ফিরিয়ে দেই কিভাবে?

এই ছিল বুযুর্গ ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা। ঠিক স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও একই কথা। তাদের থেকে প্রাপ্ত কষ্টের দিকে না তাকিয়ে তাদের দ্বারা অর্জিত সুখের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। তবেই কষ্ট ফুরিয়ে যাবে।[32]

৩. এমনকি নিজ স্ত্রী যদি দেখতে অসুন্দর ও হয় তারপরেও তার হক্কের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উদাসীন না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। কারণ হিসেবে হাদীসে বলা হয়েছে,

"উক্ত নারীর সাথে যা আছে নিজ স্ত্রীর মাঝেও তাই আছে। অতএব পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। (সুনানে দারিমী; হা.নং ২৩৮৮)

৪. নারীর প্রতি নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

ইসহাক ইবন নসর (রাহঃ) .... আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। মহানবী (ﷺ) বলেন যে, "আল্লাহ এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আর তোমরা নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাড়। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙে যাবে। আর যদি তুমি তা যেভাবে আছে সে ভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থকবে। অতএব, তোমাদেরকে ওসীয়াত করা হল নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার। (সহীহ বুখারী- ৪৮১১)

৫. ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর স্ত্রী এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা.) বদর যুদ্ধের সময় মদিনায় গুরুতর

32 স্ত্রীর অধিকার

অসুস্থ হয়ে পড়েন। যুদ্ধের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি হওয়া সত্ত্বেও, আল্লাহর রাসুল (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার চেয়ে ঘরে থেকে অসুস্থ স্ত্রীর পাশে থাকা এবং তাঁর সেবা-শুশ্রূষাকে অধিকতর জরুরি কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ রয়েছে:"বদর যুদ্ধে তাঁর (হযরত উসমানের) অনুপস্থিত থাকার কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা তাঁর স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি তখন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁকে বলেছিলেন: 'তুমি (যুদ্ধে না গিয়ে) তাঁর সেবা করার জন্য মদিনায় অবস্থান করো; তুমি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতোই সওয়াব (পুণ্য) এবং গনিমতের অংশ পাবে।'" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ৩৬৯৮)

৬. এছাড়া রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺএর সিরাত অধ্যয়নে যেই ঘটনা টি সবচেয়ে হৃদয়বিদারক, সেটি হচ্ছে উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা। উহুদ যুদ্ধে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺএর প্রিয় চাচা হযরত হামজা (রাঃ) এর শহীদ হন। তখন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা হযরত হামজা (রাঃ) এর মরদেহ বিকৃত করে তাঁর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল। অথচ, মক্কা বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম((ﷺএই নারীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। [এই ঘটনার বিবরণ, ইবনে হিশাম, আল-সিরাহ আল-নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা-৪৩ (হিন্দার ইসলাম গ্রহণ ও সাধারণ ক্ষমার বিস্তারিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট), সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৩৮২৫ ও ৭১৮০ (মক্কা বিজয়ের পর নারীদের বায়আত গ্রহণ এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) ও হিন্দার মধ্যকার মর্যাদাপূর্ণ কথোপকথনের বিবরণ)।]

এভাবেই ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, ইসলামই নারীর স্বাধীনতা কে সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে নারীর সর্বোচ্চ ও যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত সম্ভব।

ইসলামে নারীভাবনা বা ইসলামি নারীত্ব :

ইসলামি নারীত্ব কি?— What is Islam Womenhood?

ইসলামি নারীত্বের ধারণা লাভের আগে জেনে নেওয়া যাক, নারীত্ব আসলে কি? যদি একাডেমি ভাবে বলতে যাই, তাহলে "নারীত্ব হলো নারীর স্বাভাবিক জৈবিক, মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি, যা তার পরিচয়, ব্যক্তিত্ব ও সমাজে ভূমিকা

নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" নারী,নারীত্ব, মাতৃত্ব এই শব্দগুলোর সাথে কোমলতা ও সহমর্মিতামমতা ও যত্নশীলতা, লজ্জাশীলতা ওশালীনতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, সৌন্দর্যবোধ ও সৃজনশীলতা, সম্পর্ক রক্ষা ও লালন করার ক্ষমতা ইত্যাতি শব্দজোড়া গুলো ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামি নারীত্ব, এই শব্দগুচ্ছ গুলোরই প্রতিনিধিত্ব করে, শুধু এর সাথে প্রয়োজন তাকওয়া। অর্থাৎ,

ইসলামি নারীত্ব (Islamic Womanhood) হলো এমন একটি জীবনদর্শন, যেখানে নারীকে আল্লাহর বান্দা, মানবসমাজের মর্যাদাপূর্ণ সদস্য, পরিবার ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং আখিরাতমুখী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলামে নারীর পরিচয় কেবল তার লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়; বরং তার ঈমান, তাকওয়া, চরিত্র, জ্ঞান ও আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। [33]

পরবর্তী অধ্যায় সমূহে ইসলামে নারীভাবনা, নারীর অধিকার কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

পঞ্চম অধ্যায়

~ইসলামে নারীর সম্মান ও মর্যাদা~

ইসলাম নারীকে কেবল সমাজের একটি অংশ হিসেবে নয়, বরং মানবসভ্যতার নির্মাণ ও বিকাশের অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে নারীরা বৈষম্য, অবহেলা ও অধিকারবঞ্চনার শিকার হলেও ইসলাম তাদের মানবিক মর্যাদা, সম্মান ও অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহ নারীর অবস্থানকে এমন এক উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, যেখানে তার মূল্যায়ন লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়; বরং ঈমান, আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

---

[33] যদিও 'ইসলামি নারীত্ব' সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহে কোনো আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা পাওয়া যায় না, তবে ইউসুফ আল–কারযাভী, মুহাম্মদ আল–গাজ্জালি এবং জামাল বাদাউই–এর আলোচনার ভিত্তিতে ইসলামি নারীত্বকে এমন এক নারী–পরিচয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যা ঈমান, তাকওয়া, শালীনতা, আত্মমর্যাদা, জ্ঞান এবং পরিবার ও সমাজে কল্যাণকর ভূমিকার সমন্বয়ে গঠিত।

একজন নারী মা, কন্যা, স্ত্রী এবং সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে ইসলামে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সম্মান ও মর্যাদা কেবল একটি সামাজিক বিষয় নয়; বরং এটি একটি ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ, যা মানবকল্যাণ ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি।

১. সৃষ্টিগত মর্যাদা: নারী ও পুরুষের সমান মানবিক অবস্থানঃ

সৃষ্টির প্রথম মানব হযরত আদম (আ.)-এর নিঃসঙ্গতা দূর করতে ও মানব বংশ বিস্তারে আদিমাতা হযরত হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। নারীই মানবজাতির লালন-পালনকারী ও বংশগতির ধারক। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হল; তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম-২১)"

এবং,

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। (সূরা নিসা-০১)

মানুষের জীবনে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সঙ্গী হলো তার স্ত্রী। সুখে-দুঃখে, বিপদে- আপদে, ঘরে-সফরে বিবাহ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন স্ত্রী সর্বদা নিজেকে স্বামীর সেবায় নিয়োজিত রাখেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে পরস্পরের পোশাকের সাথে উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

"তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ।" —(সূরা বাকারা-১৮৭)

এছাড়াও, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক সম্মানিত, যে অধিক তাকওয়াবান।"(সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩)

আল্লাহ তায়ালা নারী- পুরুষকে একে অপরের প্রতিযোগি নয় বরং সহোযোগি বলে আখ্যায়িত করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (আত-তওবা:৭১)

এই আয়াত সমূহ প্রমাণ করে যে নারী ও পুরুষের মধ্যে মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য নেই। উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি, উভয়েই তাঁর বান্দা এবং উভয়ের জন্যই ন্যায়বিচার, সম্মান ও দায়িত্ব নির্ধারিত। ইসলাম নারীর ব্যক্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাকে পুরুষের অধীনস্থ কোনো সম্পত্তি হিসেবে নয়, বরং স্বতন্ত্র অধিকারসম্পন্ন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

২. কুরআনের আলোকে নারীর সম্মান

পবিত্র কুরআনে নারীকে সম্মান, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী... আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" — (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৩৫)

এই আয়াতে নারী ও পুরুষকে সমানভাবে ঈমান, ইবাদত ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা হয়েছে। কুরআন আরও ঘোষণা করে,

"*আমি তোমাদের কোনো কর্মীর কর্ম বিনষ্ট করি না, সে পুরুষ হোক বা নারী; তোমরা একে অপরের অংশ।" — (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯৫)*

অর্থাৎ বুঝা যায়, ইসলামে নারীর মর্যাদা তার লিঙ্গের কারণে নয়; বরং তার কর্ম, চরিত্র ও আল্লাহভীতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

৩. হাদিসের আলোকে নারীর সম্মানঃ

পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি হাদিসেও নারীর মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। মহানবী ﷺ এমন এক সমাজে আবির্ভূত হন, যেখানে নারীরা বিভিন্নভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত ছিল। তিনি নারীর প্রতি সম্মান, সহমর্মিতা এবং ন্যায়বিচারের শিক্ষা দিয়ে সমাজে তাদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বাণী ও জীবনাদর্শে নারীকে পরিবার ও সমাজের অপরিহার্য অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করা

হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের সঙ্গে সদাচরণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেছেন,

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।" (জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৮৯৫)

এই হাদিসে নারীর প্রতি উত্তম আচরণকে একজন মানুষের উত্তম চরিত্রের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নারীর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল ﷺ আরও বলেছেন,

“নারীরা পুরুষদের সহোদরা (সমমর্যাদাসম্পন্ন অংশীদার)।” (সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ২৩৬)

এই হাদিস নারী ও পুরুষের মানবিক মর্যাদার সমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে একটি বিখ্যাত হাদিস হলো,

“জান্নাত মায়ের পদতলে।” (সুনান আন-নাসাঈ)

এটি মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও সম্মানের গুরুত্বকে তুলে ধরে।

কন্যা সন্তানের প্রতিও ইসলাম বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“যে ব্যক্তি দুই কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করবে, যতক্ষণ না তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, কিয়ামতের দিন সে আমার সঙ্গে এভাবে থাকবে।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৩১)

এই হাদিসে কন্যা সন্তানকে বোঝা নয়, বরং জান্নাত লাভের একটি মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিদায় হজের ভাষণেও রাসূল ﷺ নারীদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

“নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এবং তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।”(সহিহ মুসলিম)

এ নির্দেশনা নারীদের প্রতি সম্মান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থানকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

হাদিসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারীকে অবজ্ঞা বা অবমূল্যায়নের দৃষ্টিতে দেখেনি; বরং মা, কন্যা, স্ত্রী এবং সমাজের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে তাদের

মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা ও আদর্শ নারীর প্রতি সম্মান, ভালোবাসা, ন্যায়বিচার এবং মানবিক আচরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই ইসলামে নারীর সম্মান কেবল একটি সামাজিক মূল্যবোধ নয়; বরং এটি ঈমান, নৈতিকতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপায়।
[34]

৪. তাকওয়ার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা

ইসলামের অন্যতম মৌলিক নীতি হলো মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ, বংশ, জাতি, ভাষা, বর্ণ, সম্পদ কিংবা সামাজিক অবস্থান কোনো চূড়ান্ত মানদণ্ড নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় তার ঈমান, চরিত্র, সৎকর্ম এবং সর্বোপরি তাকওয়ার ভিত্তিতে। এই নীতি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই ইসলামে নারী ও পুরুষের মর্যাদার প্রশ্নে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি লিঙ্গ নয়; বরং আল্লাহভীতি ও নৈতিক উৎকর্ষ।

তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সতর্কতা, আত্মসংযম এবং আল্লাহর ভয় ও সচেতনতার মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করা। ইসলামি পরিভাষায় তাকওয়া বলতে বোঝায়—আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। একজন মানুষের অন্তরের পবিত্রতা, নৈতিকতা ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশই হলো তাকওয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক তাকওয়াবান।"(সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩)

এই আয়াত ইসলামের মানবসমতার ঘোষণাপত্র হিসেবে বিবেচিত। এখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে পরিচয়ের জন্য, শ্রেষ্ঠত্বের জন্য নয়। প্রকৃত মর্যাদা অর্জিত হয় তাকওয়ার মাধ্যমে। ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে মর্যাদাগত বৈষম্যের কোনো সুযোগ এখানে অবশিষ্ট থাকে না।

---

34 যেহেতু পূর্ববর্তী অধ্যায়ে কোরআন ও হাদিসের অধিকাংশ উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এই অধ্যায়ে কোরআন ও হাদিসের অংশটুকু সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীদের প্রায়শই পুরুষদের তুলনায় নিম্নতর হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অনেক সমাজে নারীদের অধিকার ছিল না, তাদের মতামত মূল্যহীন মনে করা হতো এবং তাদেরকে সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। ইসলাম এই ধারণার মৌলিক পরিবর্তন এনে ঘোষণা করে যে, একজন নারীর মর্যাদা তার লিঙ্গ দ্বারা নয়, বরং তার ঈমান ও তাকওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হবে। একইভাবে একজন পুরুষও কেবল পুরুষ হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না; তাকওয়া ছাড়া তার কোনো বিশেষ মর্যাদা নেই। কোরআনে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

"আর পুরুষ বা নারীর মধ্যে কেউ মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করলে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম (অবিচার) করা হবে না।"(সূরা আন-নিসা, ৪:১২৪)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও মুক্তির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ লাভ করে। তাদের বিচার করা হবে তাদের আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতে, লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়। একইভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৫)

এই আয়াতে নারী ও পুরুষকে পাশাপাশি উল্লেখ করে তাদের আধ্যাত্মিক সমতা ও সমমর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট মর্যাদা অর্জনের পথ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সমানভাবে উন্মুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিদায় হজের ভাষণেও মানবসমতার এই নীতিকে পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

"কোনো আরবের উপর অনারবের, কোনো অনারবের উপর আরবের, কোনো শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের এবং কোনো কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব নেই; তবে তাকওয়ার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়।" (মুসনাদ আহমাদ)

এই হাদিস ইসলামের সাম্য, ন্যায় ও মানবমর্যাদার মৌলিক শিক্ষাকে প্রকাশ করে। যদিও এখানে নারী-পুরুষের প্রসঙ্গ সরাসরি উল্লেখ নেই, তবে শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে তাকওয়াকে নির্ধারণ করার মাধ্যমে লিঙ্গভিত্তিক অহংকার ও বৈষম্যকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে বহু নারী তাকওয়া, জ্ঞান, ইবাদত ও চরিত্রের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা কোনো পার্থিব পরিচয়ের কারণে নয়; বরং তাঁদের ঈমান ও তাকওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে একজন নারীর জন্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও সম্মান অর্জনের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

~নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি~

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী কেবল পরিবারের একটি অংশ নয়; বরং তিনি মা, কন্যা, স্ত্রী এবং সমাজ নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাই নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইসলামের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। ইসলাম এমন একটি সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে নারী তার মর্যাদা, আত্মসম্মান ও নিরাপত্তা বজায় রেখে জীবনযাপন করতে পারে এবং সমাজের কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

এই অধ্যায়ে ইসলামের আলোকে নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার বিভিন্ন দিক, যেমন—হিজাব ও শালীনতার ধারণা, নারীকে বস্তু হিসেবে উপস্থাপনের বিরোধিতা, পারিবারিক কাঠামোর মাধ্যমে সুরক্ষা এবং সমাজে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে। এর মাধ্যমে ইসলাম নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিষয়ে যে ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে, তা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

১. হিজাব ও শালীনতা: সম্মানের প্রতীক

ইসলামে হিজাব কেবল পোশাকের একটি ধরন নয়; বরং এটি শালীনতা, আত্মমর্যাদা ও নৈতিকতার প্রতীক। হিজাবের মূল উদ্দেশ্য হলো নারীকে সম্মানিত করা এবং তাকে ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ভিত্তিতে মূল্যায়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা। ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি সংযত রাখা এবং শালীনতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে।আল্লাহ তাআলা বলেন,

"মু'মিনদের বল তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র, তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালভাবেই অবগত।"(আন নূর-৩০)

"আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আন নূর-৩১)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে সহজে চেনা যাবে এবং তারা কষ্টপ্রাপ্ত হবে না।"(সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৯)

এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে একজন মুমিন নারী নন-মাহরাম এর সাথে পর্দা রক্ষা করে যোগাযোগ ও অন্যান্য কাজ কর্ম সম্পন্ন করবেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

আর তোমরা তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। (সূরা আহযাব-৫৩)

ঠিক একই সূরায় বলে দিয়েছেন,

"হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বলো না, যাতে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সঙ্গত ও শালীন কথাবার্তা বলবে।" (আল আহযাব-৩২)

এছাড়াও, হাদিসের কিছু নির্দেশনা যেমন—

কোনো পুরুষের সাথে কোনো নারীর একান্তে সাক্ষাৎ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি((ﷺনিষেধ করেছেন,

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ না করে, যতক্ষণ না তার সাথে কোনো মাহরাম (যাকে বিয়ে করা হারাম এমন আত্মীয়) থাকে।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

নন মাহরাম এর সামনে চেহারা প্রদর্শন করার নিষেধাজ্ঞা এবং কোনো পুরুষের যদি ভুল বশত কোনো পর নারীর দিকে চোখ পড়ে যায় তাহলে সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার শিক্ষা রাসূল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি((ﷺএর কাছ থেকে পাওয়া যায়।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আসমা বিনতে আবুবকর (রা.) পাতলা কাপড় পরিধান করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে প্রবেশ করেন। তখন রাসুল (সা.) তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন: "হে আসমা! নারী যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তার শরীরের এটা (হাত ও মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য কিছু) দেখা জায়েজ নয়।" (সুনান আবু দাউদ)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, হিজাবের উদ্দেশ্য নারীর মর্যাদা রক্ষা এবং তাকে হয়রানি ও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে সুরক্ষিত রাখা। হিজাব নারীর আত্মপরিচয় ও সম্মানের প্রতীক হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

২. নারীকে বস্তু হিসেবে উপস্থাপনের বিরোধিতা

ইসলাম নারীকে কোনো ভোগ্যপণ্য, বিনোদনের উপকরণ বা ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করার বিরোধিতা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী একজন সম্মানিত মানুষ, যার মূল্য তার সৌন্দর্য বা বাহ্যিক আকর্ষণে নয়; বরং তার মানবিক গুণাবলি, জ্ঞান, চরিত্র ও তাকওয়ায়।

পবিত্র কুরআন নারীকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে পুরুষের মতোই আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরিচিত করেছে। ইসলাম নারীর ব্যক্তিত্বকে সম্মান করে এবং তাকে এমন কোনো উপায়ে উপস্থাপন করাকে সমর্থন করে না, যা তার মানবিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। সূরা ইসরা তে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"আমি আদাম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদের জন্য জলে স্থলে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে পবিত্র রিযক দিয়েছি আর আমি তাদেরকে আমার অধিকাংশ সৃষ্টির উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা -ইসরা :৭০)

আধুনিক সমাজে অনেক ক্ষেত্রে নারীকে বিজ্ঞাপন, বিনোদন বা বাণিজ্যিক প্রচারণার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইসলাম এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরুৎসাহিত

করে, কারণ এটি নারীর ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করে তাকে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে মূল্যায়ন করার প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ নারীদের সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে বিবেচনা করতে বলেছেন। এর মাধ্যমে ইসলাম নারীকে বস্তু নয়, বরং সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) নারীদের বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে বলেন:

"হে মানুষ! তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে তাদের গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বৈধ করেছ। তাদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে, তোমাদের ওপরও তাদের তেমন অধিকার রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম -১২১৮)

অর্থাৎ, নারীরা পুরুষের সম্পত্তি নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত আমানত। যার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং যথাযথ মর্যাদা রক্ষার্থে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

৩. পারিবারিক কাঠামো ও নারীর সুরক্ষা

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার মানবসমাজের মৌলিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। একটি সুস্থ, স্থিতিশীল ও মূল্যবোধনির্ভর পরিবার শুধু ব্যক্তি নয়, বরং পুরো সমাজের কল্যাণ ও স্থিতিশীলতার ভিত্তি। ইসলাম পরিবারকে ভালোবাসা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, সম্মান, সহযোগিতা এবং দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই পারিবারিক কাঠামোর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করা।

ইসলামে নারীকে কখনো একা ও অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখা হয়নি। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তার সম্মান, নিরাপত্তা ও প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করে পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন নারী কন্যা হিসেবে পিতার স্নেহ ও অভিভাবকত্ব লাভ করে, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর ভালোবাসা ও

দায়িত্বশীলতার অধিকারী হয় এবং মা হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। এভাবে পরিবার নারীকে একটি নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অবস্থান প্রদান করে।

পবিত্র কুরআনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রশান্তির ভিত্তিতে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর-রূম, ৩০:২১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামের পারিবারিক কাঠামো কর্তৃত্ব বা আধিপত্যের ভিত্তিতে নয়; বরং ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পরিবারে নারীকে সম্মানিত সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যার সঙ্গে সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো ভালোবাসা এবং দয়া।

ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, বাসস্থান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"পুরুষরা নারীদের দায়িত্বশীল ও অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের একদলকে অন্যদলের উপর কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।"(সূরা আন-নিসা, ৪:৩৪)

এই দায়িত্বকে ইসলাম কোনো বিশেষ মর্যাদার প্রতীক হিসেবে নয়, বরং পরিবারের কল্যাণ ও নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার একটি দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করেছে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নারীর মৌলিক অধিকারগুলোর একটি, যা ইসলাম স্বামীর ওপর বাধ্যতামূলক করেছে।

নারীর প্রতি সদাচরণের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম।"(জামে আত-তিরমিযি, হাদিস: ৩৮৯৫)

এই হাদিস পারিবারিক জীবনে নারীর প্রতি সম্মান, সৌহার্দ্য ও সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে। ইসলামে আদর্শ পরিবার সেই পরিবার, যেখানে নারী অবহেলা বা নির্যাতনের শিকার নয়; বরং সম্মান, ভালোবাসা ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করে।

কুরআন স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছে,

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।" (সূরা আন-নিসা, ৪:১৯)

এই নির্দেশনা ইসলামের পারিবারিক নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এতে বোঝা যায় যে, নারীর প্রতি রূঢ়তা, অবিচার বা অপমানমূলক আচরণ ইসলামের শিক্ষা নয়; বরং উত্তম আচরণ ও সম্মান প্রদর্শনই ইসলামের নির্দেশ।

ইসলাম সন্তানদেরকেও মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। একজন মা হিসেবে নারীর মর্যাদা এতটাই উচ্চ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার মায়ের অধিকার উল্লেখ করার পর বাবার অধিকারের কথা বলেছেন। এটি পরিবারে নারীর সম্মান ও গুরুত্বের একটি অনন্য উদাহরণ।

পারিবারিক কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানসিক নিরাপত্তা। ইসলাম এমন একটি পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়, যেখানে নারী ভয়, অপমান বা অনিশ্চয়তার মধ্যে নয়; বরং ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে। পরিবার কেবল অর্থনৈতিক নিরাপত্তার স্থান নয়; এটি আবেগিক সমর্থন, আত্মমর্যাদা এবং মানসিক প্রশান্তিরও উৎস।

সুতরাং ইসলামের পারিবারিক কাঠামো নারীর স্বাধীন সত্তা, সম্মান ও নিরাপত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে একটি সুরক্ষিত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান করে। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনায় গড়ে ওঠা পরিবারব্যবস্থা নারীর প্রতি দায়িত্ব, ভালোবাসা ও সম্মানকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত, যা সমাজে তার মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অন্যতম কার্যকর মাধ্যম।

৪. সমাজে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

ইসলামের অন্যতম মৌলিক লক্ষ্য হলো একটি শান্তিপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে। নারীর নিরাপত্তা ইসলামে কেবল একটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয় নয়; বরং এটি একটি সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব। ইসলাম এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, যেখানে নারী শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল ধরনের অনিরাপত্তা থেকে মুক্ত থেকে তার জীবন পরিচালনা করতে পারে।

ইসলাম নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বপ্রথম নৈতিকতা ও আত্মসংযমের শিক্ষা দিয়েছে। কুরআন নারী-পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের পবিত্রতা রক্ষা করে... আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের পবিত্রতা রক্ষা করে।” (সূরা আন-নূর, ২৪:৩০-৩১)

এই নির্দেশনার মাধ্যমে ইসলাম সমাজে পারস্পরিক সম্মান, শালীনতা এবং নিরাপত্তার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চায়। কারণ সামাজিক নিরাপত্তা কেবল আইন দ্বারা নয়, বরং নৈতিক মূল্যবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারীর সম্মানহানি ও চরিত্রহননের বিরুদ্ধে ইসলাম কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে,

"আর যারা সচ্চরিত্রা নারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত করো এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।" (সূরা আন-নূর, ২৪:৪)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, নারীর সম্মান ও সুনাম রক্ষার জন্য ইসলাম অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মিথ্যা অপবাদ, গুজব বা চরিত্রহননকে ইসলাম গুরুতর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

"আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কোনো অপরাধ ছাড়াই কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।"(সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৫৮)

এই আয়াত নারীকে যেকোনো ধরনের মানসিক, সামাজিক বা শারীরিক নির্যাতন থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব তুলে ধরে। ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেওয়া বা হয়রানি করা একটি বড় গুনাহ।

তাছাড়া, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ﷺএর সিরাত অধ্যয়ন করলে জানা যাবে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর সম্মান ও নিরাপত্তার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের একটি ঐতিহাসিক ও অনন্য দৃষ্টান্ত হলো বনু কায়নুকা যুদ্ধ। দ্বিতীয় হিজরিতে বনু কায়নুকার বাজারে এক মুসলিম নারী শ্লীলতাহানির শিকার হলে এবং তার সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টাকারী একজন মুসলিম সাহাবিকে হত্যা করা হলে, রাসুলুল্লাহ (সা.) একে কেবল সাধারণ অপরাধ হিসেবে দেখেননি; বরং এটিকে মদিনা সনদের চরম লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারীর আত্মসম্মানের ওপর আঘাত হিসেবে বিবেচনা করেন। তৎকালীন জাহেলি সমাজে যেখানে নারীরা ছিল চরম অবহেলিত, সেখানে একজন সাধারণ নারীর সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে মহানবী (সা.) পুরো গোত্রের বিরুদ্ধে ১৫ দিনের সামরিক অবরোধ ঘোষণা করেন এবং তাদের মদিনা থেকে বহিষ্কার করেন, যা প্রমাণ করে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা রক্ষায় প্রয়োজনে যুদ্ধ ঘোষণা করতেও রাষ্ট্র কুণ্ঠাবোধ করে না।

সর্বোপরি, সমাজে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনায় এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে, যেখানে নারীর জীবন, সম্মান ও মর্যাদা সুরক্ষিত থাকবে এবং তিনি একজন পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামে নারীর সম্মান ও নিরাপত্তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

সপ্তম অধ্যায়

~ইসলামে নারীর অধিকার, লিঙ্গ সমতা ও ক্ষমতায়ন~

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়, সাম্য ও মর্যাদার ভিত্তিতে অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। নারীকে ইসলাম কেবল সমাজের একটি অংশ হিসেবে নয়, বরং একজন স্বতন্ত্র মানবসত্তা হিসেবে মূল্যায়ন করে তার জন্য বিভিন্ন মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নারীর জীবন, সম্মান, শিক্ষা, সম্পদ, পরিবার এবং সমাজে অংশগ্রহণের অধিকার সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ মহান আল্লাহ বলেন,

"আর নারীদের জন্যও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের ওপর কর্তব্য রয়েছে।"

(সূরা আল-বাকারা, ২:২২৮)

এই আয়াত নারীর অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠা করে। একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিদায় হজের ভাষণে নারীদের প্রতি সদাচরণ ও তাদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন।

১.শিক্ষা অর্জনের অধিকার:

কুরআন নারী ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পক্ষে কথা বলে। সূরা আল-যুমার এ, আল্লাহ জ্ঞানের অন্বেষণকে উৎসাহিত করেছেন, বলেছেন:

"যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না) ***বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। "*** *(সূরা যুমার-০৯)*

এই আয়াত জ্ঞানী মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরে। এখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি; বরং জ্ঞানকে মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কুরআনে জোর দেওয়া আরেকটি মৌলিক নীতি হল সমতা। লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির। সূরা আল-হুজুরাত (49:13) এ বলা হয়েছে:

*"হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ। এবং পরিচিত।" এই আয়াতটি তুলে ধরে যে লিঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টতার ভিত্তি হওয়া উচিত নয়; বরং, এটা একজনের ধার্মিকতা এবং ধার্মিকতা যা আল্লাহর কাছে তাদের মূল্য নির্ধারণ করে। ফলস্বরূপ, ইসলামী সমাজ ঐতিহাসিকভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে, ইতিহাস জুড়ে উল্লেখযোগ্য মুসলিম নারী পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা।" (*আল-হুজুরাত ৪৯:১৩)

কুরআন ও হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নর ও নারীর জন্য আলাদাভাবে কোনো আলোচনা করা হয় নি। ইসলামের প্রথম ওহিই ছিল জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি আহ্বান। মহান আল্লাহ বলেন,

"পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।"— সূরা আল-আলাক, ৯৬:১

নারী শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে হাদিস কি বলে?[35]

জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতা মুসলিমদের জন্য অবশ্য করণীয় বা ফরয। নারী পুরুষ ভেদে ইসলামের শিক্ষা (জ্ঞান অর্জন) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাসূল

35 নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, *“ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর নারী) জন্য ফরয।”*

নারীরা শুধু শিক্ষিত নয়, শিক্ষকও হতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ছিলেন অন্যতম একজন শিক্ষক। এছাড়াও উম্মে সালমা, উম্মে হাবিবা, হাফসা, আসমা বিনতে আবু বকর, মায়মুনা, উম্মে হানী প্রমুখ মহিলা সাহাবিয়ার নাম প্রথম সারিতে এসে যায়।আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ছাত্র উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন,

‘আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখি নি। ’[36]

আরবী কাব্য ও কবিতায় উরওয়া ইবন্ যুবায়র রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, কাব্য বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা -এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি তো কথায় কথায় কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।

আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। ইবনে ইমাদ হাম্বলী নিম্নোক্ত ভাষায় তার কথা উল্লেখ করেছেনঃ

“আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান আনসারী বিজ্ঞ ফিকহবিদ ছিলেন। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। অতএব, তাঁর নিকট থেকে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং মজবুত স্মৃতিশক্তি ও ধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সর্বদা গৃহীত হতো।

ইবাদত এবং জ্ঞান চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। খাওলা বিনতে কায়েস আল্-জুহানিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেনঃ

“জুম‘আর দিনে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।’

36 হাফিজ যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি., পৃ.২৭।

হারিসা ইবনু নু'মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেনঃ "*আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুম'আর খুতবাতে এটি পড়তেন।*"

মহিলারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, *আপনার কাছে পুরুষরা এত ভিড় লাগিয়ে থাকে যে, অনেক সময় আমাদের পক্ষে আপনার কথা শুনা সম্ভবই হয় না। অতএব আমাদের জন্য আপনি আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই দিন তিনি তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিতেন এবং সৎকাজের নির্দেশ দান করতেন।*"

মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেনঃ '*'তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।*"

সুতরাং বলা যায় যে, ইসলাম কখনোই নারী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি বরং উৎসাহিত করেছে। আধুনিক বিশ্বে নারী শিক্ষা ব্যক্তিগত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এবং সামাজিক নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নারীর শিক্ষা অর্জনের অধিকার নিশ্চিত করা হলে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হতে পারে। তাই ইসলামে নারী শিক্ষা কোনো আধুনিক ধারণা নয়; বরং এটি ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই স্বীকৃত একটি মৌলিক অধিকার।

২.সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক অধিকার (মেহর, উত্তরাধিকার)

ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক ও সম্পত্তিগত অধিকারকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। মানব ইতিহাসের দীর্ঘ সময় ধরে বহু সমাজে নারীদের সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার কিংবা স্বাধীন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে নারী নিজেই সম্পত্তির অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো। এমন একটি প্রেক্ষাপটে ইসলাম নারীর স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক সত্তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাকে সম্পত্তি অর্জন, ভোগ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পূর্ণ অধিকার প্রদান করে।

মেহর: নারীর স্বতন্ত্র আর্থিক অধিকার

মেহর ইসলামী বিবাহব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি নারীর জন্য নির্ধারিত একটি বাধ্যতামূলক আর্থিক অধিকার। বিবাহের সময় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত অর্থ, সম্পদ বা মূল্যবান উপহারকে মেহর বলা হয়। এটি কোনো দান, অনুগ্রহ বা উপহার নয়; বরং স্ত্রীর ন্যায্য অধিকার। মহান আল্লাহ বলেন,

"তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারীদের তাদের মেহর প্রদান করো।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৪)

"আর তাদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে ভোগ করেছ (স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছ), তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর পরিশোধ কর। মোহর নির্ধারণের পর কোনো বিষয়ে পরস্পর সম্মত হলে তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই।" (সূরা নিসা, ৪:২৪)

হাদিসে এসেছে, *সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) এক ব্যক্তিকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়ে বললেন, "একটি লোহার আংটি হলেও মোহর হিসেবে জোগাড় করে দাও।" (সহীহ বুখারী)*

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো নারীকে দেনমোহর দেওয়ার ওয়াদায় বিয়ে করে, কিন্তু তা আদায়ের কোনো ইচ্ছা তার থাকে না, তবে কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সামনে ব্যাভিচারী হিসেবে দাঁড়াবে।"(মুসনাদে আহমদ)

এই আয়াত ও হাদীস সমূহ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে মেহর নারীর নিজস্ব সম্পদ এবং এর ওপর অন্য কারও অধিকার নেই। স্ত্রী ইচ্ছামতো মেহর ব্যবহার, সঞ্চয়, দান বা বিনিয়োগ করতে পারেন। ইসলামের এই বিধান নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মেহর নারীর মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীকও বটে। এটি বিবাহকে দায়িত্বশীল ও সম্মানজনক সম্পর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং স্ত্রীকে আর্থিকভাবে সুরক্ষিত করার একটি ব্যবস্থা প্রদান করে।

উত্তরাধিকার: নারীর সম্পত্তির অধিকার

ইসলামের অন্যতম যুগান্তকারী অবদান হলো নারীর উত্তরাধিকারের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ইসলামের পূর্বে অধিকাংশ সমাজে নারীরা উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। ইসলাম প্রথমবারের মতো কন্যা, স্ত্রী, মা ও বোনের জন্য নির্ধারিত অংশ ঘোষণা করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ রেখে যায়, তাতে পুরুষের অংশ রয়েছে এবং নারীরও অংশ রয়েছে; তা অল্প হোক বা বেশি হোক, নির্ধারিত অংশ।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৭)

সন্তানের সম্পদে পিতা-মাতা ও স্ত্রীর অধিকার প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন: এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। কিন্তু শুধু কন্যা যদি দুইয়ের অধিক থাকে, তবে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ এবং মাত্র একজন কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। মৃতের সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ..." (সুরা আন-নিসা, আয়াত: ১১)

স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর অংশ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের জন্য এক-অষ্টমাংশ..." (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১২)

হাদীসে এসেছে, *হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ওয়ারিশদের উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে, আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন তার জান্নাতের উত্তরাধিকার কেড়ে নেবেন।" (সুনান ইবনে মাজাহ)*

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, ইসলাম নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির মৌলিক নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামে নারীকে তার পারিবারিক অবস্থান অনুযায়ী উত্তরাধিকার প্রদান করা হয়। যেমন মা, স্ত্রী, কন্যা ও বোন প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সম্পদের অংশীদার হন।

অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অংশ নারীর তুলনায় বেশি হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়। তবে ইসলামী বিধানে এর পেছনে অর্থনৈতিক দায়িত্বের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষকে পরিবারের ভরণ-পোষণ, বাসস্থান, স্ত্রীর ব্যয় এবং সন্তানদের দায়িত্ব বহন করতে হয়, অথচ নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ তার নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। ফলে উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও অধিকার উভয় দিক বিবেচনা করা হয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

ইসলামে নারীদের ব্যবসা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। শরিয়তের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে নারীরা স্বাধীনভাবে সম্পদ অর্জন, মালিকানা ভোগ, এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবেন।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় যে মহানবী ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা বিনতে খোয়ায়লিদ (রাঃ) ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি নিজস্ব পুঁজি ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতেন এবং সমাজে একজন সম্মানিত উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও কর্মদক্ষতাকে স্বীকৃতি দেয়। তবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে শালীনতা, নৈতিকতা ও ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা

ইসলাম নারীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার পিতা, স্বামী বা নিকটাত্মীয় পুরুষ সদস্যদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। ফলে নারীকে নিজের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে উপার্জনের দায়িত্ব বহন করতে হয় না। একই সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আয় ও সম্পদ সম্পূর্ণ তার নিজস্ব বলে গণ্য হয়।

এছাড়া যাকাত, সদকা ও সামাজিক সহায়তার মাধ্যমে অসহায় ও দরিদ্র নারীদের সুরক্ষার ব্যবস্থাও ইসলামে বিদ্যমান। এর ফলে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও মানবিক সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩. নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সাধারণত এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে নারী নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে, আত্মমর্যাদা অর্জন করে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর ক্ষমতায়ন কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানবিক মর্যাদা, শিক্ষা, নৈতিক বিকাশ, সামাজিক অংশগ্রহণ এবং আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার ভোগের সমন্বিত ধারণা। ইসলাম নারীকে সর্বপ্রথম একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

“হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।” (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩)

এই আয়াত নারী ও পুরুষের মানবিক মর্যাদার সমতা ঘোষণা করে। ইসলামে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি লিঙ্গ নয়; বরং তাকওয়া, নৈতিকতা ও সৎকর্ম।

ইসলাম বিবাহে নারীর সম্মতিকে অপরিহার্য করেছে এবং তাকে পরিবারে সম্মানজনক অবস্থান প্রদান করেছে। একজন মা হিসেবে নারীর মর্যাদাকে বিশেষভাবে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, *“মায়ের পদতলে সন্তানে জান্নাত।” (সুনানে ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ)*

এছাড়া নারীরা সামাজিক, শিক্ষামূলক ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বহু নারী সমাজসেবা, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অবদান রেখেছেন।

ইসলাম নারীর মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। বিশেষ করে উম্মে সালামা (রাঃ) এর পরামর্শ " হুদায়বিয়ার সন্ধি" এর সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। *"৬ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরের পর সাহাবিদের মধ্যে তীব্র হতাশা দেখা দেয়। তখন রাসুল (সা.) সাহাবিদের পশু কোরবানি করতে ও মাথা মুণ্ডাতে বললে শোকে ও ক্ষোভে কেউই তা পালন করছিলেন না। এমন সংকটময় মুহূর্তে উম্মে সালমা (রা.) রাসুল (সা.)-কে পরামর্শ দেন, "আপনি কারও সাথে কোনো কথা না বলে নিজেই আপনার পশু কোরবানি করুন এবং নাপিত ডেকে মাথা মুণ্ডন করুন।"রাসুল (সা.) তাঁর এই দূরদর্শী পরামর্শ মেনে চলেন। তাঁকে অনুসরণ করে সাহাবিরাও নিজেদের পশু কোরবানি করেন এবং মাথা মুণ্ডন করেন,   যার ফলে চরম বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতা থেকে মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পায়।"*

এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে নারীর প্রজ্ঞা ও মতামতের মূল্য রয়েছে।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতায়ন

ইসলামে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের ভিত্তি হলো ঈমান, তাকওয়া এবং নৈতিক চরিত্র। কুরআনে আল্লাহ বলেন,

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক তাকওয়াবান।” — সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩

এখানে লিঙ্গ নয়, বরং তাকওয়াকে মর্যাদার ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে ইসলাম নারীর আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রদান করে।

সর্বোপরি, ইসলামে নারীর ক্ষমতায়ন কোনো আধুনিক ধারণার ফল নয়; বরং এটি ইসলামের মৌলিক শিক্ষার একটি অংশ। শিক্ষা, অর্থনীতি, পরিবার, সমাজ ও আধ্যাত্মিক জীবনে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ইসলাম তাকে

একটি সম্মানিত, দায়িত্বশীল এবং সক্রিয় মানবসত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামী দৃষ্টিতে প্রকৃত ক্ষমতায়ন হলো এমন একটি অবস্থান, যেখানে নারী তার আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করে, নিজের সামর্থ্য বিকশিত করে এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের কল্যাণে ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

৪. বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা

ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে আধ্যাত্মিক ও মৌলিক মানবাধিকারের দিক থেকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তবে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পরিপূরক সমতা বা ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে। ইসলামে বিবাহ (নিকাহ) কেবল একটি সামাজিক চুক্তি নয়; বরং এটি একটি পবিত্র বন্ধন, যা পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম নারী ও পুরুষকে মানবিক মর্যাদার দিক থেকে সমান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বৈবাহিক জীবনে উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। তাই ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা বলতে নারী ও পুরুষের অভিন্ন ভূমিকা বোঝানো হয় না; বরং উভয়ের মর্যাদা, অধিকার ও ন্যায়সঙ্গত আচরণের নিশ্চয়তাকে বোঝায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।” — সূরা আর-রূম, ৩০:২১

এই আয়াত বৈবাহিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি হিসেবে ভালোবাসা, শান্তি ও পারস্পরিক সহমর্মিতার কথা তুলে ধরে।

সমাজে যেন কেউ অবিবাহিত না থাকে, সেজন্য স্বাধীন মানুষের পাশাপাশি দাস-দাসীদেরও বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য সমাজ ও মালিকদের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ ও যোগ্য, তাদেরও। তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন।"(সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২)

বিধবা বা বিবাহবিচ্ছিন্না নারীদের জোরপূর্বক আটকে রাখা বা তাদের পুনর্বিবাহে বাধা সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ করে আল্লাহ বলেন,

"আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তারা যদি পারস্পরিক নিয়মানুযায়ী সম্মত হয়, তবে তারা নিজেদের পছন্দমতো স্বামী গ্রহণ করলে তোমরা তাদের বাধা দিও না।"(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩২)

নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কাউকে বিয়ে করা বা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের ওপর অধিকার খাটানো হারাম ঘোষণা করে বলা হয়েছে,

"হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারের বস্তু বানানো তোমাদের জন্য হালাল নয়।"(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯)

ইসলামে নারীর সম্মতি ছাড়া বিবাহ বৈধ নয়। কোনো নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে ইসলাম অনুমতি দেয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"কোনো বিধবা নারীকে তার পরামর্শ (বা সম্মতি) ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং কোনো কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না।" সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কুমারী মেয়ের অনুমতি কেমন করে জানা যাবে? তিনি বললেন, "তার চুপ থাকা (লজ্জায় কিছু না বলে চুপ থাকা) অবয়বই তার অনুমতি।"(সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৫১৩৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ১৪১৯)

যদি কোনো অভিভাবক মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দেন, তবে ইসলাম মেয়েকে সেই বিয়ে ভেঙে দেওয়ার বা বাতিল করার পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। হাদিসে এসেছে

খানসা বিনতে খিযাম আল-আনসারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি যখন ডিভোর্সি (বা বিধবা) ছিলেন, তখন তার পিতা তার সম্মতি ছাড়া তাকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেন। এই বিয়ে তার পছন্দ ছিল না। তাই তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে অভিযোগ করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তখন ওই বিয়েটি বাতিল করে দিলেন।(সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৫১৩৮)

কুমারী মেয়ের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। সুনানে ইবনে মাজাহ-র হাদিসে এসেছে

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একটি কুমারী মেয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল যে, তার পিতা তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে দিয়েছেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বিয়ে বহাল রাখা বা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার দিলেন।(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ১৮৭৫; আবু দাউদ, হাদিস নং: ২০৯৬)

রাসুলুল্লাহ (সা.) অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন,

"তোমরা নারীদের তাদের বিয়ের ব্যাপারে জোর করবে না।"(সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং: ৩২৬১)

এই হাদিস নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। ফলে বিবাহের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের মতামতের গুরুত্ব রয়েছে।

ইসলামে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই একে অপরের প্রতি অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে—

"নারীদের জন্য ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের ওপর দায়িত্ব রয়েছে।" — সূরা আল-বাকারা, ২:২২৮

এই আয়াত বৈবাহিক জীবনে পারস্পরিক ভারসাম্য ও ন্যায়বিচারের নীতি প্রতিষ্ঠা করে। স্বামী যেমন স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বশীল, তেমনি স্ত্রীও স্বামীর প্রতি দায়িত্বশীল। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে বর্ণনা করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে—

"তোমরা একে অপরের পোশাক এবং তারা তোমাদের পোশাক।" — সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৭

পোশাক যেমন মানুষকে আচ্ছাদন, সুরক্ষা ও সৌন্দর্য প্রদান করে, তেমনি স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও কল্যাণের উৎস। এই উপমা বৈবাহিক সম্পর্কে সমান মানবিক মর্যাদার ধারণাকে প্রকাশ করে।

ইসলামে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর অর্পিত হয়েছে। একই সঙ্গে স্ত্রী তার নিজস্ব সম্পদ, মেহর এবং উপার্জনের ওপর পূর্ণ মালিকানা ভোগ করেন। স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির ওপর কোনো অধিকার রাখেন না, যদি না স্ত্রী স্বেচ্ছায় তা প্রদান করেন।এটি বৈবাহিক জীবনে নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে, যা তার মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্ত্রীর জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন,

"তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বাস কর, সেখানে তাদেরও বাসের ব্যবস্থা কর এবং তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য উত্ত্যক্ত করো না।"(সূরা আত-তালাক, আয়াত: ৬)

পরিবারের পেছনে খরচ করাকে ইসলামে সর্বোচ্চ সওয়াবের কাজ বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যা-ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দাও, তারও সওয়াব পাবে।"(সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৫৬)

এক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের ওপর আমাদের স্ত্রীদের কী অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন,

"তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে, তুমি যখন পোশাক পরিধান করবে তাকেও পোশাক দেবে, তার মুখে কখনো আঘাত করবে না, তাকে গালি দেবে না এবং (অভিমান করে) নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তাকে ছেড়ে রাখবে না।"(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং: ২১৪২)

তাছাড়াও, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদের প্রতি সদাচরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের কাছে তোমাদের চেয়ে বেশি উত্তম।"(সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং: ৩৮৯৫; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ১৯৭৭)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে বৈবাহিক সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হলো সদাচরণ, ভালোবাসা এবং ন্যায়বিচার।

ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা মানে নারী ও পুরুষের সব দায়িত্ব ও ভূমিকা অভিন্ন হওয়া নয়; বরং উভয়ের মানবিক মর্যাদা, অধিকার, সম্মান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। ইসলাম "সমতা" এবং "ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্য" এর সমন্বয় ঘটিয়েছে। তাই বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীকে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক হিসেবে দেখা হয়।

৫.লিঙ্গ সমতা:

লিঙ্গ সমতা (Gender Equality) বলতে নারী ও পুরুষ উভয়ের মানবিক মর্যাদা, মৌলিক অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং সামাজিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন অবস্থানকে বোঝায়। আধুনিক সমাজে লিঙ্গ সমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলেও ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই নারী ও পুরুষের মানবিক মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি এবং উভয়েরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও দায়িত্ব রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

“হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক সম্মানিত, যে অধিক তাকওয়াবান।”

— সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে ইসলামে মানুষের মর্যাদার ভিত্তি লিঙ্গ, বংশ বা সামাজিক অবস্থান নয়; বরং তাকওয়া ও নৈতিকতা।

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই সমান মানবিক মর্যাদা প্রদান করেছে। উভয়েই আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে দায়িত্ব পালন করে এবং উভয়েই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। কুরআনে বলা হয়েছে,

“নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদাবান করেছি।”— সূরা আল-ইসরা, ১৭:৭০

এখানে নারী ও পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। ফলে ইসলামে নারীর মর্যাদা কোনোভাবেই পুরুষের চেয়ে কম নয়।

ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই ঈমান, ইবাদত এবং নেক আমলের প্রতিদান সমান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী... আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।”— সূরা আল-আহযাব, ৩৩:৩৫

এই আয়াত প্রমাণ করে যে আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও পরকালের প্রতিদানের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই।

ইসলামে লিঙ্গ সমতা বলতে নারী ও পুরুষকে সর্বক্ষেত্রে অভিন্ন বা একরূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। ইসলাম স্বীকার করে যে শারীরিক, জৈবিক ও কিছু সামাজিক

দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য রয়েছে। তাই ইসলামে "সমান মর্যাদা" (equal dignity) এবং "ভিন্ন দায়িত্ব" (different responsibilities)-এর মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, পুরুষের ওপর পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, অন্যদিকে নারীর জন্য মাতৃত্বকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তবে এসব পার্থক্য মর্যাদাগত বৈষম্য নয়; বরং দায়িত্বের ভিন্নতা।

আধুনিক লিঙ্গ সমতার কিছু তত্ত্ব নারী ও পুরুষের সম্পূর্ণ অভিন্নতা (sameness) প্রতিষ্ঠার কথা বলে। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হলো—ন্যায়ভিত্তিক সমতা (equitable equality)। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার, মর্যাদা ও প্রয়োজন বিবেচনায় এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যা ন্যায় ও ভারসাম্য নিশ্চিত করে।

সর্বোপরি, ইসলামে লিঙ্গ সমতা মানবিক মর্যাদা, ন্যায়বিচার এবং পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই আল্লাহর বান্দা হিসেবে সমান মর্যাদা দিয়েছে এবং শিক্ষা, সম্পত্তি, আধ্যাত্মিক জীবন ও সামাজিক অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকৃতি দিয়েছে। একই সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের পার্থক্যকে বিবেচনায় রেখে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করেছে। ফলে ইসলামী লিঙ্গ সমতার ধারণা কেবল অধিকারের সমতা নয়, বরং মর্যাদা, ন্যায় এবং দায়িত্বের সমন্বিত রূপ।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইসলাম নারীকে সমাজের একটি প্রান্তিক বা নির্ভরশীল সত্তা হিসেবে নয়, বরং পূর্ণ মর্যাদাসম্পন্ন ও অধিকারপ্রাপ্ত মানবসত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নারীর জীবন, শিক্ষা, সম্পত্তি, বিবাহ, পরিবার এবং সামাজিক অংশগ্রহণের অধিকার সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সুরক্ষিত হয়েছে। এসব অধিকার নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সমাজে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ইসলাম নারীর অধিকারকে কোনো মানবসৃষ্ট অনুগ্রহ হিসেবে নয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে। তাই নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং একটি ধর্মীয় কর্তব্যও বটে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক। এই

পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মান এবং দায়িত্ববোধের মাধ্যমেই একটি সুশৃঙ্খল পরিবার ও কল্যাণমুখী সমাজ গড়ে ওঠে।

অতএব, ইসলামে নারীর মৌলিক অধিকারসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, পরিবারে স্থিতিশীলতা এবং সমাজে ন্যায় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলাম প্রদত্ত এই অধিকারসমূহ নারীকে সম্মান, নিরাপত্তা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে পরিচালিত করে এবং মানবকল্যাণভিত্তিক একটি আদর্শ সমাজ গঠনের ভিত্তি রচনা করে।

অষ্টম অধ্যায়

~নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকা: ভারসাম্যের ধারণা~

ইসলাম নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকার ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। একদিকে নারীকে সম্মান, স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে তাকে পরিবার, সমাজ ও ধর্মের প্রতি কিছু দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে দায়িত্ব কোনো শাস্তি বা বোঝা নয়; বরং এটি একটি আমানত, যা যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে পৃথিবীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তবে তাদের দায়িত্বের প্রকৃতি ও ক্ষেত্রভেদে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, যা তাদের স্বাভাবিক সামর্থ্য, পারিবারিক ভূমিকা এবং সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলাম নারীর দায়িত্বকে কেবল গৃহস্থালির কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং একজন নারী একই সঙ্গে মা, স্ত্রী, কন্যা, শিক্ষিকা, সমাজসেবক এবং একজন ঈমানদার মুসলিম হিসেবে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করতে পারেন। ইসলামী চিন্তাধারায় নারীর দায়িত্ব ও অধিকার একে অপরের পরিপূরক; কারণ দায়িত্ব ছাড়া অধিকার এবং অধিকার ছাড়া দায়িত্ব সমাজে ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে না। তাই ইসলামে নারীর

ভূমিকা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক—সব দিককে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১. সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন নারীর সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো তাঁর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার প্রতি দায়িত্ব পালন করা। মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত, আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। তাই একজন মুসলিম নারীর পরিচয় কেবল একজন কন্যা, স্ত্রী বা মাতা হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সর্বাগ্রে তিনি আল্লাহর একজন বান্দাহ। এই পরিচয়ই তাঁর অন্যান্য সকল দায়িত্ব ও ভূমিকার ভিত্তি নির্ধারণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।” (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে মানুষের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত। তাই একজন নারীর দায়িত্ব হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্বের প্রথম স্তর হলো ঈমান বা বিশ্বাস। আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদিরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা একজন মুসলিম নারীর মৌলিক দায়িত্ব। এই বিশ্বাস তার জীবনকে অর্থবহ করে এবং সকল কাজের জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত, ইবাদত পালন সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্বের অন্যতম প্রধান অংশ। নামাজ, রোজা, যাকাত (যদি ফরজ হয়), হজ (সামর্থ্য থাকলে), কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া এবং জিকিরের মাধ্যমে একজন নারী আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেন। ইসলামে ইবাদত শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত প্রতিটি বৈধ কাজই ইবাদত হিসেবে গণ্য হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৫)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে ইবাদত মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যম।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন। তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করে। ইসলামে মানুষের মর্যাদা লিঙ্গ, বংশ বা সম্পদের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না; বরং তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে অধিক তাকওয়াবান।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩)

এই আয়াত নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে।

এছাড়াও একজন নারীর দায়িত্ব হলো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের নৈতিক শিক্ষা অনুসরণ করা, হালাল-হারামের সীমারেখা মেনে চলা এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে জীবনযাপন করা সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো।" (সূরা আন-নিসা, ৪:৫৯)

একজন মুসলিম নারী যখন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা করেন, তখন তিনি কেবল নিজের কল্যাণই অর্জন করেন না; বরং পরিবার ও সমাজের জন্যও কল্যাণের উৎসে পরিণত হন।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সবর (ধৈর্য) ও শুকর (কৃতজ্ঞতা)। জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি এবং বিভিন্ন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা একজন মুমিন নারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ হন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। যদি সে সুখ লাভ করে, তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে; আর যদি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়, তবে ধৈর্য ধারণ করে।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৯৯৯)

পরিশেষে বলা যায়, সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালন একজন নারীর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ঈমান, ইবাদত, তাকওয়া, আনুগত্য, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অগ্রসর হন। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত সফলতা পার্থিব অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তিই একজন মুমিন নারীর সর্বোচ্চ লক্ষ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই নারীর জীবনের অন্যান্য দায়িত্ব ও ভূমিকা যথার্থ অর্থে পূর্ণতা লাভ করে।

২. নিজের প্রতি দায়িত্ব :

ইসলাম মানুষকে নিজের কল্যাণ ও আত্মশুদ্ধির প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। একজন নারীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলে নিজের ঈমানের যত্ন নেওয়া ও ঈমান কে পাকাপোক্ত করা। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবী-রাসূল এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, সে গ্রন্থের প্রতি যা তিনি তাঁর রাসূলের ওপর অবতীর্ণ করেছেন এবং সে গ্রন্থের প্রতিও যা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ এবং পরকালকে অস্বীকার করে, সে ভয়ানক বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়।"— (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬)

নিজের হক্ক যথাযথ ভাবে পালন করার অন্যতম মাধ্যম হলো নিজের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করা। কারণ একজন ব্যক্তি নিজেই যদি সুস্থ, সচেতন ও সুশিক্ষিত না হন, তাহলে তিনি অন্যের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।” (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৫)

এছাড়াও, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

"নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনীত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাযতকারী পুরুষ ও

নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।"— সূরা আল-আহ্যাব, আয়াত: ৩৫

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে নিজের শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। রাসূল ﷺ বলেছেন,

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

এই হাদিস নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। তাই শিক্ষা অর্জন ও আত্মোন্নয়ন নারীর অন্যতম দায়িত্ব।

৩. পারিবারিক দায়িত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার মানবসমাজের মৌলিক ভিত্তি এবং একটি সুস্থ, নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের প্রধান কেন্দ্র। এই পরিবারব্যবস্থার স্থিতিশীলতা, সৌন্দর্য ও কল্যাণ অনেকাংশে নারীর দায়িত্বশীল ভূমিকার উপর নির্ভরশীল। ইসলাম নারীর পারিবারিক দায়িত্বকে শুধু গৃহস্থালির কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তাকে পরিবারে ভালোবাসা, শিক্ষা, নৈতিকতা, মানবিকতা ও মূল্যবোধের ধারক ও বাহক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। একজন নারী কন্যা, বোন, স্ত্রী এবং মা—প্রতিটি পরিচয়ে পরিবারের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

আল্লাহ তাআলা পরিবারকে শান্তি ও প্রশান্তির কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর; এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর-রূম, ৩০:২১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠায় নারী ও পুরুষ উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে।

কন্যা হিসেবে দায়িত্ব

একজন নারী যখন কন্যা হিসেবে জীবন শুরু করেন, তখন তার প্রথম দায়িত্ব হলো পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার করা। ইসলাম পিতা-মাতার সেবাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং তাদের প্রতি সদাচরণকে আল্লাহর ইবাদতের পরেই স্থান দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।" (সূরা আল-ইসরা, ১৭:২৩)

একজন আদর্শ কন্যা তার পিতা-মাতার সম্মান রক্ষা করে, তাদের প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ায় এবং পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় রাখতে ভূমিকা পালন করে।

স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব

বিবাহ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। স্ত্রী হিসেবে নারীর দায়িত্ব হলো স্বামীর সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, আন্তরিকতা ও ভালোবাসার ভিত্তিতে সংসার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা। ইসলামে বৈবাহিক সম্পর্ককে কর্তৃত্বের নয়, বরং পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকারের সম্পর্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।" (সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৭)

এই আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পোশাকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা পারস্পরিক সুরক্ষা, সৌন্দর্য, নৈকট্য ও সম্মানের প্রতীক।

স্ত্রীর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ রাখা, স্বামীর সঙ্গে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং পরিবারের কল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করা। তবে ইসলামে এসব দায়িত্বের পাশাপাশি নারীর অধিকারও সমানভাবে স্বীকৃত। তাই পারিবারিক জীবন পারস্পরিক সম্মান ও দায়িত্ববোধের ভিত্তিতেই পরিচালিত হওয়া উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করে।" (জামে আত-তিরমিজি, হাদিস: ৩৮৯৫)

এই হাদিস পারিবারিক জীবনে পারস্পরিক সদাচরণের গুরুত্ব তুলে ধরে।

মা হিসেবে দায়িত্ব

মাতৃত্ব ইসলামে নারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব। একজন মা কেবল সন্তান জন্মদানই করেন না, বরং তার চরিত্র, নৈতিকতা, ধর্মীয় চেতনা ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। সন্তানের প্রথম শিক্ষাগুরু হিসেবে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছরে তার দুধ ছাড়ানো সম্পন্ন হয়।" (সূরা লুকমান, ৩১:১৪)

এই আয়াত মাতৃত্বের ত্যাগ ও কষ্টের প্রতি আলোকপাত করে।

সন্তানের সঠিক শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ, ইসলামী আদর্শ ও মানবিক গুণাবলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন সৎ ও সচেতন মা একটি সৎ ও আদর্শ প্রজন্ম গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"জান্নাত মায়ের পদতলে।" (সুনান আন-নাসাঈ, হাদিস: ৩১০৪)

আরেক হাদিসে তিনি বলেছেন,

"তোমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করো, তারপর মায়ের প্রতি, তারপর মায়ের প্রতি, এরপর বাবার প্রতি।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫৪৮)

এই হাদিসগুলো ইসলামে মাতৃত্বের মর্যাদা ও গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

পরিবারে নৈতিক ও শিক্ষাগত দায়িত্ব

পরিবারের নৈতিক পরিবেশ রক্ষা এবং সন্তানদের সঠিক শিক্ষা প্রদান নারীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। একজন মা ও অভিভাবক হিসেবে নারী সন্তানদের মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, শিষ্টাচার, মানবিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।” (সূরা আত-তাহরিম, ৬৬:৬)

এই আয়াত পরিবারকে নৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে।

পারিবারিক দায়িত্বে ভারসাম্যের ধারণা

ইসলামে পারিবারিক দায়িত্বকে শুধুমাত্র নারীর একক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। বরং পরিবার পরিচালনা নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌথ দায়িত্ব। স্বামী যেমন পরিবারের ভরণপোষণ, নিরাপত্তা ও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন, তেমনি স্ত্রী পরিবারে ভালোবাসা, লালন-পালন, শিক্ষা ও নৈতিক পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এই পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমেই একটি আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।” (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮২৯)

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর পারিবারিক দায়িত্ব অত্যন্ত সম্মানজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ। কন্যা, স্ত্রী ও মা হিসেবে তিনি পরিবারে ভালোবাসা, স্থিতিশীলতা, শিক্ষা ও নৈতিকতার ভিত্তি নির্মাণ করেন। পরিবারকে একটি শান্তিপূর্ণ, আদর্শ ও ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। তাই ইসলামে পারিবারিক দায়িত্বকে নারীর মর্যাদা হ্রাসের নয়, বরং তার সম্মান, গুরুত্ব ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৪. সামাজিক দায়িত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় অংশ। ইসলাম নারীকে কেবল পারিবারিক পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তাকে সমাজের কল্যাণ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা বিস্তার এবং মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ ও দায়িত্ব

প্রদান করেছে। একজন নারী তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নৈতিকতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়ন ও মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। তাই ইসলামে সামাজিক দায়িত্ব পালনকে ইবাদতের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়।কুরআনে মুমিন নারী ও পুরুষের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে,

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের সহায়ক। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।" (সূরা আত-তাওবা, ৯:৭১)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে সমাজ সংস্কার, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা এবং কল্যাণমূলক কাজে নারী-পুরুষ উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে।

শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে ভূমিকা

একটি শিক্ষিত সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন নারী নিজে শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে পারেন। একজন মা হিসেবে তিনি সন্তানদের প্রথম শিক্ষাগুরু, আবার একজন শিক্ষক, গবেষক বা শিক্ষাবিদ হিসেবেও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।" (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস: ২২৪)

এই নির্দেশনা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। ইসলামের ইতিহাসে বহু নারী হাদিস, ফিকহ, সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আয়িশা (রা.), যিনি ইসলামী জ্ঞানচর্চার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মানবসেবা ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম

মানবসেবা ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। অসহায়, দরিদ্র, এতিম, বিধবা ও বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একজন মুসলিম নারীর সামাজিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো।"(সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২)

এই আয়াত সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে। একজন নারী দান-সদকা, স্বেচ্ছাসেবা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা কার্যক্রম এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন।

নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

সমাজের নৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নারীর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন নারী তার আচরণ, চরিত্র, কথা ও কর্মের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে পারেন। সততা, শালীনতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা এবং মানবিকতা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাঅপরিসীম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।"(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৫৫৯)

নারীর উত্তম চরিত্র পরিবার ও সমাজ উভয়ের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং একটি নৈতিক সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা

ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এবং সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। একজন নারীও সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করার দায়িত্ব বহন করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও।"(সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৫)

এই নির্দেশনা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সমাজে অন্যায়, বৈষম্য, দুর্নীতি ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়া একজন সচেতন মুসলিম নারীর সামাজিক দায়িত্ব।

সমাজ গঠনে নারীর ঐতিহাসিক অবদান

ইসলামের ইতিহাসে বহু নারী সমাজ, শিক্ষা ও মানবকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। খাদিজা (রা.) ব্যবসা ও সমাজসেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আয়িশা (রা.) জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁদের জীবন থেকে বোঝা যায় যে ইসলাম নারীর ইতিবাচক সামাজিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং সমাজের উন্নয়নে তাঁর অবদানকে মূল্যায়ন করে। এমনকি যুদ্ধেও নারীদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও যুদ্ধের ময়দানে অস্ত্র হাতে লড়াই করেছেন। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলেন হজরত নুসাইবা বিনতে কা'ব (রা.)। ওহুদের যুদ্ধে তিনি তরবারি ও ধনুক হাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন রক্ষায় ঢাল হিসেবে কাজ করেছিলেন। সাহসিকতার জন্য মহানবী (সা.) তাঁকে "খাতুনে ওহুদ" উপাধিতে ভূষিত করেন। যুদ্ধের সময় আহত সৈন্যদের সেবা ও শুশ্রূষা করা নারীদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল। হজরত রুফাইদা আল-আসলামিয়্যা (রা.) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নারী নার্স হিসেবে পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে একটি নারী দল যুদ্ধক্ষেত্রে অস্থায়ী হাসপাতাল পরিচালনা করতেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের পানি পান করানো, খাবার সরবরাহ করা, তীর বা অস্ত্র বহন করা এবং রসদ পৌঁছে দেওয়ার কাজে নারীরা সক্রিয় ভূমিকা রাখতেন। হজরত উম্মে আতিয়া আনসারি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এই দায়িত্বগুলো পালন করেছিলেন।

সামাজিক দায়িত্ব পালনে ভারসাম্য

ইসলাম নারীর সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের শিক্ষা দেয়। সামাজিক অংশগ্রহণ যেন পারিবারিক দায়িত্ব, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সে বিষয়ে ইসলাম গুরুত্বারোপ করে। অর্থাৎ একজন নারী পরিবার, সমাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সর্বোত্তম অবদান রাখতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৮২৯)

এই হাদিস সমাজের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ববোধের গুরুত্ব তুলে ধরে।

সর্বোপরি, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সামাজিক দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষা বিস্তার, মানবসেবা, নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সত্যের পক্ষে অবস্থান

গ্রহণ এবং সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন নারী সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নারী কেবল সমাজের একজন সদস্য নন; বরং তিনি সমাজ গঠন, সংস্কার এবং মানবকল্যাণের অন্যতম প্রধান শক্তি। তাঁর সক্রিয় ও দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

৫ আধ্যাত্মিক দায়িত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের প্রকৃত সফলতা কেবল পার্থিব অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং আখিরাতে মুক্তি অর্জনই প্রকৃত সফলতা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যেক মুসলিম নারীকে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে হয়। আধ্যাত্মিক দায়িত্ব বলতে এমন সকল কাজ ও গুণাবলিকে বোঝায়, যা মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ককে দৃঢ় করে এবং তাকে নৈতিক ও আত্মিক উৎকর্ষের দিকে পরিচালিত করে।

ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সুযোগ সমান। আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নয়, বরং ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্মই মূল বিবেচ্য বিষয়। তাই একজন মুসলিম নারীর দায়িত্ব হলো নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি, ইবাদতের প্রতি আন্তরিকতা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“নিশ্চয়ই সে-ই সফল হয়েছে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে।”(সূরা আশ-শামস, ৯১:৯)

এই আয়াত আত্মশুদ্ধির গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নকে সফলতার অন্যতম শর্ত হিসেবে ঘোষণা করে

আধ্যাত্মিক দায়িত্বের ভিত্তি হলো ঈমান। একজন মুসলিম নারীর দায়িত্ব হলো আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, রাসূলগণ, আখিরাত এবং তাকদিরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। ঈমান মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিকতা সৃষ্টি করে, যা তাকে সৎপথে পরিচালিত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।" (সূরা আল-আনফাল, ৮:২)

একজন নারীর আধ্যাত্মিক জীবনের মূল শক্তি হলো এই ঈমান, যা তাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল ও অনুগত করে তোলে।

ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

ইবাদত আধ্যাত্মিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নামাজ, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, দোয়া এবং নফল ইবাদতের মাধ্যমে একজন নারী আল্লাহর সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে পারেন। ইবাদত শুধু আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি আত্মার প্রশান্তি এবং হৃদয়ের পরিশুদ্ধির মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"(সূরা আর-রা'দ, ১৩:২৮)

একজন নারী যখন আন্তরিকতার সঙ্গে ইবাদত করেন, তখন তিনি মানসিক শান্তি, আত্মিক শক্তি এবং জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি লাভ করেন।

তাকওয়া অর্জন

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ইসলামী আধ্যাত্মিকতার অন্যতম মূল ভিত্তি। তাকওয়া মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে। একজন মুসলিম নারীর দায়িত্ব হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর উপস্থিতির অনুভূতি ধারণ করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক তাকওয়াবান।" (সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলামে মর্যাদার মাপকাঠি লিঙ্গ নয়, বরং তাকওয়া।

আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন

আধ্যাত্মিক দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়াতুন নফস)। মানুষের অন্তরে বিদ্যমান অহংকার, হিংসা, লোভ, ক্রোধ ও কপটতার মতো নেতিবাচক

প্রবণতা দূর করে বিনয়, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, সততা এবং দয়ার মতো গুণাবলি অর্জন করা একজন নারীর দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"নিশ্চয়ই আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পরিপূর্ণ করার জন্য।"

(মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ৮৯৫২)

একজন আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ নারী কেবল নিজের জীবনকেই সুন্দর করেন না, বরং পরিবার ও সমাজেও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেন।

ধৈর্য (সবর) ও কৃতজ্ঞতা (শুকর)

জীবনের নানা পরীক্ষা, সংকট ও প্রতিকূলতার মধ্যে ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা একজন মুমিন নারীর আধ্যাত্মিক দায়িত্বের অংশ। ইসলামে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"

(সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৩)

আরও বলেন,

"যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বৃদ্ধি করে দেব।"(সূরা ইবরাহিম, ১৪:৭)

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা মানুষের অন্তরকে দৃঢ় করে এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে।

দাওয়াহ ও সৎকাজে উদ্বুদ্ধকরণ

আধ্যাত্মিক দায়িত্ব কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্যদের কল্যাণের জন্যও কাজ করা এর অংশ। একজন মুসলিম নারী তার পরিবার, সন্তান এবং সমাজকে সৎকাজের প্রতি উৎসাহিত করতে পারেন এবং নৈতিক মূল্যবোধ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে।"(সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৪)

এই দায়িত্ব সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ গঠনে সহায়তা করে।

আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালনে নারীর মর্যাদা

ইসলামের ইতিহাসে বহু নারী তাদের তাকওয়া, ইবাদত, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে অনন্য মর্যাদা অর্জন করেছেন। মারইয়াম (আ.)-কে কুরআনে পবিত্রতা ও আল্লাহভীতির আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে খাদিজা (রা.), ফাতিমা (রা.) এবং আয়িশা (রা.), হযরত আছিয়া (আ.) তাঁদের ঈমান, জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার জন্য মুসলিম ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আধ্যাত্মিক দায়িত্ব ইসলামী জীবনের কেন্দ্রবিন্দু এবং একজন নারীর ব্যক্তিত্ব গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। ঈমান, ইবাদত, তাকওয়া, আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং সৎকাজের মাধ্যমে একজন নারী আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারেন এবং আত্মিক উৎকর্ষ লাভ করতে সক্ষম হন। ইসলামের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির পথ নয়; বরং এটি পরিবার ও সমাজে নৈতিকতা, শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠারও একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তাই একজন মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকার আলোচনায় আধ্যাত্মিক দায়িত্ব একটি অপরিহার্য ও মৌলিক বিষয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী কেবল পরিবারের সদস্য নন; বরং তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক এবং আল্লাহর একজন নিবেদিত বান্দাহ। তাই ইসলামে নারীর দায়িত্বকে নিজের প্রতি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি, পরিবার, সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি কর্তব্যের সমন্বয়ে বিবেচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে, একজন নারী নিজের আত্মউন্নয়ন, শিক্ষা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জন করতে পারেন। একই সঙ্গে পরিবারে কন্যা, স্ত্রী ও মা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব

সমাজের নৈতিক ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তদুপরি, শিক্ষা, মানবসেবা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী সমাজ উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামে অধিকার ও দায়িত্ব একে অপরের পরিপূরক। নারীর মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাঁকে দায়িত্বশীল, সচেতন এবং কল্যাণমুখী জীবনযাপনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ফলে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর দায়িত্ব কোনো বোঝা নয়; বরং তা তাঁর মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব এবং মানবিক অবদানের স্বীকৃতি।

অতএব, বলা যায় যে ইসলাম নারীর জন্য এমন একটি জীবনদর্শন উপস্থাপন করেছে, যেখানে অধিকার ও দায়িত্ব, ব্যক্তি ও সমাজ, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে এক সুন্দর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ভারসাম্যই একজন নারীকে আত্মিকভাবে সমৃদ্ধ, সামাজিকভাবে কার্যকর এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সফল করে তোলে। এর মাধ্যমে নারী কেবল নিজের জীবনকেই আলোকিত করেন না, বরং পরিবার, সমাজ এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

নবম অধ্যায়

~আধুনিক নারীবাদ বনাম ইসলামি নারীত্ব~

একবিংশ শতাব্দীতে নারী-অধিকার, স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক অংশগ্রহণের প্রশ্ন বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে দুটি প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গি—আধুনিক নারীবাদ (Modern Feminism) এবং ইসলামি নারীত্ব (Islamic Womanhood)। উভয় ধারাই নারীর মর্যাদা ও কল্যাণকে গুরুত্ব দিলেও তাদের দার্শনিক ভিত্তি, মূল্যবোধ, স্বাধীনতার ধারণা এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের ব্যাখ্যায় মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

আধুনিক নারীবাদ মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে নারীর অবস্থানকে পুনর্নির্ধারণ করতে চায়। অন্যদিকে ইসলাম নারীকে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তা হিসেবে বিবেচনা করে, যার মর্যাদা আল্লাহপ্রদত্ত এবং যার অধিকার ও দায়িত্ব উভয়ই একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামোর মধ্যে নির্ধারিত। ইসলাম নারীকে শুধু অধিকারভোগী নয়, বরং পরিবার, সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণের একজন গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে উপস্থাপন করে।

এই অধ্যায়ে আধুনিক নারীবাদের মৌলিক ধারণা এবং ইসলামি নারীত্বের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হবে, যাতে নারীর স্বাধীনতা, সমতা, ন্যায়বিচার ও মর্যাদা বিষয়ে উভয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

আধুনিক নারীবাদের মূল ধারণা

নারীবাদের মূল ধারণা ও ইতিহাস দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নারীবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে সংক্ষেপে নারীবাদের মূল ধারণাগুলো হলো—

ক. Gender Equality (লিঙ্গভিত্তিক সমতা)

নারীবাদের অন্যতম কেন্দ্রীয় ধারণা হলো নারী ও পুরুষের জন্য সমান সুযোগ ও সমান অধিকার নিশ্চিত করা। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী যেন পুরুষের সমপর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

খ. Individual Autonomy (ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন)

আধুনিক নারীবাদ ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। একজন নারী তার শিক্ষা, কর্মজীবন, বিবাহ, জীবনধারা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখেন এ ধারণা নারীবাদী চিন্তার একটি মৌলিক উপাদান।

গ. Patriarchy Critique (পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর সমালোচনা)

অনেক নারীবাদী চিন্তাবিদ মনে করেন যে ঐতিহাসিকভাবে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পুরুষ-প্রাধান্যভিত্তিক ছিল, যার ফলে নারীরা সুযোগ ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছেন। তাই সামাজিক কাঠামোর সংস্কারকে তারা অপরিহার্য মনে করেন।

ঘ. নারীর ক্ষমতায়ন (Women's Empowerment)

নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক নেতৃত্ব বৃদ্ধিকে নারীবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

ইসলামে স্বাধীনতার ধারণা

ইসলামে স্বাধীনতা একটি দায়িত্বশীল ও নৈতিক ধারণা। ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করে, তবে সেই স্বাধীনতা আল্লাহর বিধান, ন্যায়নীতি এবংসামাজিক কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।" (সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৬)

এই আয়াত মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার একটি মৌলিক ভিত্তি উপস্থাপন করে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত স্বাধীনতা হলো প্রবৃত্তির দাসত্ব, সামাজিক অবিচার এবং মানুষের ওপর মানুষের আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর আনুগত্যে জীবন পরিচালনা করা।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ :

নারীবাদে স্বাধীনতা হলো স্বনিয়ন্ত্রিত, এতে অন্য কারো কল্যান- অকল্যানের ব্যাপারগুলো বিবেচিত হয় না। এখানে সমতা বলতে নারীপুরুষের কোনো ভিন্নতা থাকা চলবেনা এবং ন্যায্যতার কোনো ধারণা এখানে পাওয়া যায় না রবং নারীবাদীরা পুরুষকে তাদের প্রতিযোগি মনে করে থাকে।

কিন্তু, ইসলাম নারী- পুরুষকে বিবেচনাহীন ভাবে সমতার অধিকার প্রদান করেনি বরং প্রয়োজন ভিত্তিতে নারীকে ন্যায্য অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোথাও নারীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে উপস্থাপন করেনি বরং উভয়কে উভয়ের জন্য সহযোগী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, নারীকে পুরুষের পরিচ্ছদ ও পুরুষকে নারীর পরিচ্ছদের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। কখনোও বা নারীকে পুরুষের তুলনায় অধিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

প্রশ্ন: ইসলাম কি নারীবাদের বিরোধীতা করে?

যদি প্রশ্ন আসে ইসলাম নারীবাদ এর বিরোধীতা করে? যদি করে তাহলে কেনো করে? আর যদি না করে তাহলে কেনো করে না?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে," নারীবাদ" শব্দ টার একটু ব্যাখ্যা জেনে নেওয়া যাক। নারী' (স্ত্রীলিঙ্গ) এবং 'বাদ' (মতাদর্শ বা মতবাদ) মিলে গঠিত হয়েছে 'নারীবাদ'। নারী + বাদ = নারীবাদ (নারীদের সমান অধিকারের আন্দোলন বা চিন্তাধারা)। অর্থাৎ, নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেই কার্যক্রম তাই নারীবাদ।

বলে রাখা ভালো, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, নারীবাদের প্রয়োজনীয়তা কোথায় এবং কেনো দেখা দিয়েছিল। আমরা জানতে পারি, ১৮শ শতকে ইউরোপে, তৎকালীন নারীদের প্রতি প্রকৃতপক্ষেই চরম বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করেছিল। যা নারীবাদের প্রথম ঢেউ নামে পরিচিত।

এবার আসি, ইসলাম পূর্ব জাহেলী আরবের ইতিহাসে। সেখনেও আমরা দেখতে পাই নারীর প্রতি নিদারুণ নিষ্ঠুরতা ও বৈষম্যের চিত্র। ঠিক তখনই আরবে রহমত ও সুসংবাদের দূত হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ((ﷺকে পাঠান এবং তিনি সকল প্রকার জাহেলি পনা, বর্বরতা বিপক্ষে গিয়ে নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং নারীদের প্রতি সম্মানের শিক্ষা দেন তাঁর ((ﷺ উম্মত দের। পুরো পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ যদি নারীর অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে বেশী কথা বলে থাকেন, সবচেয়ে বেশী উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন তাহলে রসুলল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ((ﷺ থাকবেন প্রথম সারিতে। যদিও, এর পূর্বে যদিও মূসা (আ.) ও অন্যান্য নবি -রাসূলগণ নারীর অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার ছিলেন।

অতএব দেখা যায়, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর অধিকার নিয়ে আওয়াজ তোলা ইসলামের ইতিহাসেও রয়েছে, সুতরাং ইসলাম কখনোই নারীবাদ এর বিপক্ষে হতে পারে না।

কিন্তু, নারীবাদের কিছু বিষয় যেমন পুরুষের বিরোধিতা, পুরুষকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা, উগ্রবাদ, সমতা ইত্যাদি খুটিনাটি বিষয়গুলো বিতর্কিত এবং ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধকে চরম ভাবে আঘাত করে এবং কখনোও কখনোও এই বিষয়গুলো সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা সমাজের স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ইসলাম জোড়ালোভাবে এই বিষয়গুলোর বিরোধী, কেননা ইসলাম শন্তির ধর্ম, আত্নসমর্পণের ধর্ম ও ইসলাম বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে।

সুতরাং, ইসলাম নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মর্যাদার বিরোধিতা করে না; বরং তা নিশ্চিত করতে চায়। তবে ইসলাম নারীবাদের সেইসব ধারণার সমালোচনা করে, যা তার আকীদা, নৈতিকতা ও পারিবারিক মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাই বলা যায়, ইসলাম সব ধরনের নারীবাদের বিরোধিতা করে না; বরং ইসলামী নীতিমালা ও মূল্যবোধের সঙ্গেসামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলো গ্রহণ করে এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলো প্রত্যাখ্যান করে।

পরবর্তী অধ্যায়ে তাই, নারীবাদের কোন বিষয় গুলো সমালোচিত এবং নারীবাদ প্রকৃতপক্ষে নারীর অধিকার যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে কিনা, তা নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

দশম অধ্যায়

পশ্চিমা নারীবাদ কি প্রকৃতপক্ষে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে? — একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা

গত দুই শতাব্দীতে পশ্চিমা নারীবাদ বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং আইনি সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। নারী ভোটাধিকার আন্দোলন থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—নারীবাদের বিভিন্ন ধারা নারীর সামাজিক অবস্থানের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

তবে একই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও উত্থাপিত হয়েছে—নারীবাদ কি নারীর সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে? নাকি কিছু ক্ষেত্রে নতুন ধরনের সামাজিক, পারিবারিক ও মানসিক সংকটেরও জন্ম দিয়েছে?

বিশেষত ইসলামি চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং সংস্কৃতিবিদদের একটি অংশ মনে করেন যে পশ্চিমা নারীবাদের কিছু ধারণা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সফল হলেও এর কিছু ফলাফল পরিবারব্যবস্থা, নারীর স্বতন্ত্র পরিচয়, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তাই নারীবাদের অর্জনের পাশাপাশি এর সীমাবদ্ধতাগুলোও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

১. পরিবার ভাঙনের ইস্যু: স্বাধীনতা নাকি বিচ্ছিন্নতা?

পরিবার মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ইসলাম পরিবারকে সমাজের ভিত্তি এবং মানবজীবনের প্রশান্তির কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আর-রূম ৩০:২১)

পশ্চিমা সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরিবারকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয়, বরং ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের মাধ্যম হিসেবে দেখা শুরু হয়েছে বলে সমালোচকরা মনে করেন। এর ফলে দেখা যায়—

- বিবাহের হার কমে যাওয়া
- বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি
- একক অভিভাবক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি
- সন্তান লালন-পালনে জটিলতা
- পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা

যখন ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পারিবারিক দায়িত্বের উপরে স্থান দেওয়া হয়, তখন পরিবারব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

ইসলাম স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে না; বরং স্বাধীনতা ও দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

২. নারীর পণ্যায়ন (Objectification): মুক্তি নাকি নতুন শোষণ?

নারীবাদের অন্যতম দাবি ছিল নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহারের অবসান ঘটানো। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আধুনিক ভোক্তাবাদী সমাজে নারীর শরীর ও সৌন্দর্যকে এখনও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিজ্ঞাপন, বিনোদন, চলচ্চিত্র, ফ্যাশন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীর উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে তার জ্ঞান, দক্ষতা বা চরিত্রের চেয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

সমালোচকরা প্রশ্ন তোলেন, যদি একজন নারীকে তার চিন্তা, মেধা ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে তার শরীরের আকর্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে সেটি কি প্রকৃত স্বাধীনতা, নাকি নতুন ধরনের শোষণ?

নারীর তথাকথিত স্বাধীনতাকে অনেক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান বিপণন কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। ফলে নারী কখনো কখনো নিজেই ভোগবাদী সংস্কৃতির পণ্যে পরিণত হচ্ছেন।

আজকের বিশ্বে অসংখ্য পণ্য বিক্রির জন্য নারীর সৌন্দর্য ও শরীরকে বিপণনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর ফলে নারীর মানবিক গুণাবলি, জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে তার বাহ্যিক সৌন্দর্যকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা এই প্রবণতাকে “sexual objectification” নামে অভিহিত করেছেন। এর ফলে নারীর আত্মসম্মান, আত্মপরিচয় এবং মানসিক সুস্থতার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

ইসলাম নারীর মর্যাদার ভিত্তি হিসেবে সৌন্দর্য, সম্পদ বা বাহ্যিক আকর্ষণকে নয়; বরং তাকওয়া, চরিত্র ও মানবিক গুণাবলিকে গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ বলেন,

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান।” (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩)

৩. ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামিতার অধিকার :নাকি মূল্যবোধের অবক্ষয়?

আধুনিক বা তৃতীয়-চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদীরা মনে করেন, ট্রান্সজেন্ডার নারীরাও নারী এবং তারা সমাজে আরও বেশি বৈষম্যের শিকার হন। তাই নারীবাদী আন্দোলনে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। বর্তমানের মূলধারার বিশ্বব্যাপী নারীবাদ

ট্রান্সজেন্ডার অধিকারকে পুরোপুরি সমর্থন করে। এছাড়া, নারীবাদ নারীর নিজের শরীর ও যৌনতার ওপর তার নিজস্ব অধিকারের কথা বলে। সমকামী অধিকার এবং একজন নারীর নিজের সঙ্গী বেছে নেওয়ার এই স্বাধীনতাকে সমর্থন করে।

ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামীতার মতো বিকৃত কাজগুলো শুধু ধর্মীয় মূল্যবোধকেই আঘাত করেনা বরং এটি মানবিক মূল্যবোধকেও আঘাত করে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এই ধরনের অপরাধ কে কবিরা গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কওমে লুত (হজরত লুত আ.-এর জাতি) সমকামিতাসহ চরম মাত্রার অশ্লীলতা ও পাপাচারের কারণে ভয়াবহ খোদায়ি শাস্তির শিকার হয়েছিল। তাদের জনবসতি উল্টিয়ে দেওয়া হয়, উপর থেকে পাথর বর্ষণ করা হয় এবং ভয়াবহ ভূমিকম্প ও প্রচণ্ড বাতাসে তাদের সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সুরা হুদের ৮২ ও ৮৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

"অতঃপর যখন আমার নির্দেশ এসে পৌঁছাল, তখন আমি ওই জনপদের ওপরের অংশ নিচে করে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করলাম। এগুলো আপনার রবের পক্ষ থেকে চিহ্নিত করা ছিল এবং এ শাস্তি জালেমদের থেকে খুব বেশি দূরে নয়।"

৪. পোশাকের স্বাধীনতা ও এর সামাজিক প্রভাব

আধুনিক নারীবাদের একটি বহুল আলোচিত বিষয় হলো পোশাক নির্বাচনের স্বাধীনতা। এই মতবাদ অনুযায়ী, একজন নারী কী পোশাক পরবেন তা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।

তবে আধুনিক ফ্যাশন শিল্প ও গণমাধ্যম এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করেছে যেখানে নারীর মূল্য অনেক সময় তার বাহ্যিক আকর্ষণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এর ফলে কিছু সামাজিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দিতে পারে—

- শরীর নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ

- সৌন্দর্যের অবাস্তব মানদণ্ড
- আত্মবিশ্বাসের সংকট
- নিজেকে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করার প্রবণতা
- বাহ্যিক সৌন্দর্যকে আত্মমর্যাদার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা

বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে নারীরা প্রায়ই এমন এক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে যান, যা বাস্তবতার চেয়ে কৃত্রিম মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামে শালীনতার ধারণা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। এর উদ্দেশ্য মানুষকে সীমাবদ্ধ করা নয়; বরং তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে বাহ্যিক প্রদর্শনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। আল্লাহ্ বলেন—

"তবে তাকওয়ার পোশাকই সর্বোত্তম।"
(সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৬)

৫. অবাধ মেলামেশা (Free Mixing) ও সম্পর্কের সংকট

আধুনিক সমাজে নারী-পুরুষের একসঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ, কর্মক্ষেত্রে কাজ করা এবং সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বর্তমানে খুব মামুলি বিষয়। ইসলামও প্রয়োজনীয় সামাজিক ও পেশাগত যোগাযোগকে বৈধতা দেয়। তবে ইসলাম নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে শালীনতা, সংযম এবং নৈতিকতার উপর গুরুত্বারোপ করে।
সমালোচকদের মতে, যখন নারী-পুরুষের সম্পর্ক দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার পরিবর্তে শুধুমাত্র আবেগ, আকর্ষণ এবং ব্যক্তিগত ভোগের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তখন নানা সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন—

- সম্পর্কের অস্থিরতা
- প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা
- মানসিক আঘাত
- অবৈধ সম্পর্ক বৃদ্ধি
- পরিবার ভাঙন
- যৌন হয়রানি ও অনিরাপত্তা

বর্তমান যুগে অনেক তরুণ-তরুণী সম্পর্কের ভাঙন, আবেগগত নির্ভরতা এবং মানসিক হতাশার কারণে দীর্ঘমেয়াদি মানসিক সংকটে ভুগছেন। সমালোচকদের মতে, নৈতিক সীমারেখাহীন সম্পর্ক সংস্কৃতি এই সমস্যাগুলোকে আরও জটিল করে তুলেছে।

কুরআন নারী-পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে..." (সূরা আন-নূর ২৪:৩০)

"আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে..." (সূরা আন-নূর ২৪:৩১)

৬. মানসিক চাপ, একাকীত্ব ও Identity Crisis

আধুনিক নারীর সামনে আজ এক নতুন চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে—তিনি কে?

তিনি কি শুধুই একজন পেশাজীবী? নাকি একজন মা? নাকি একজন স্ত্রী? নাকি একজন স্বাধীন ব্যক্তি?

সমাজ অনেক সময় নারীর কাছে প্রত্যাশা করে যে তিনি একই সঙ্গে সবক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সফল হবেন। ফলে অনেক নারী প্রবল মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও আত্মপরিচয় সংকটের মধ্যে পড়েন।

সমালোচকদের মতে, আধুনিক সমাজে নারীর সাফল্যকে প্রায়শই অর্থনৈতিক ও পেশাগত অর্জনের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। ফলে মাতৃত্ব, পরিবার পরিচালনা বা গৃহকেন্দ্রিক অবদানকে কখনো কখনো কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এ অবস্থায় অনেক নারী অনুভব করেন,

- জীবনের লক্ষ্য নিয়ে বিভ্রান্তি
- আত্মপরিচয়ের সংকট
- একাকীত্ব
- মানসিক অবসাদ
- সামাজিক চাপ

ইসলাম নারীর পরিচয়কে একমাত্র কোনো একটি ভূমিকায় সীমাবদ্ধ করে না। একজন নারী একই সঙ্গে আল্লাহর বান্দা, মা, কন্যা, স্ত্রী, শিক্ষিকা, পেশাজীবী এবং সমাজের সক্রিয় সদস্য হতে পারেন।

৬ সব সংস্কৃতিতে এক মডেল চাপিয়ে দেওয়ার সমস্যা

পশ্চিমা নারীবাদ মূলত ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সামাজিক বাস্তবতায় গড়ে উঠেছে। কিন্তু পৃথিবীর সব সমাজ একই রকম নয়।
দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য কিংবা মুসলিম সমাজগুলোর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতা পশ্চিমা সমাজের তুলনায় ভিন্ন।
সমালোচকরা মনে করেন, যখন পশ্চিমা নারীবাদের একটি নির্দিষ্ট মডেলকে বিশ্বজনীন সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, তখন স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সামাজিক বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ,

- হিজাব পরা অনেক মুসলিম নারী এটিকে ধর্মীয় পরিচয় ও মর্যাদার অংশ হিসেবে দেখেন।
- পরিবারকেন্দ্রিক জীবনকে অনেক নারী স্বেচ্ছায় বেছে নেন।
- ধর্মীয় মূল্যবোধকে অনেক নারী ক্ষমতায়নের উৎস মনে করেন।

কিন্তু কিছু পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি এসব অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়।
কুরআন মানবজাতির বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়ে বলে—
"আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো।" (সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১৩)

পশ্চিমা নারীবাদ নারীর শিক্ষা, রাজনৈতিক অধিকার, আইনি সুরক্ষা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কিন্তু একই সঙ্গে পরিবারব্যবস্থার দুর্বলতা, সম্পর্কের অস্থিরতা, নারীর পণ্যায়ন, পরিচয় সংকট, মানসিক চাপ এবং সাংস্কৃতিক একরূপতা আরোপের মতো বিষয়গুলো নিয়ে গুরুতর বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছে।
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর মর্যাদা কেবল সীমাহীন স্বাধীনতার মধ্যে নয়; বরং দায়িত্ব, নৈতিকতা, পারিবারিক বন্ধন, আধ্যাত্মিকতা এবং মানবিক মর্যাদার সমন্বয়ে

নিহিত। তাই নারীর প্রকৃত কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে অধিকার ও কর্তব্য, স্বাধীনতা ও সংযম, ব্যক্তিসত্তা ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ অনুসরণ করা প্রয়োজন।

এই ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলামি নারীত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যেখানে নারীকে প্রতিযোগিতার বস্তু নয়, বরং সম্মানিত মানুষ, সমাজগঠনের অংশীদার এবং আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান বান্দা হিসেবে দেখা হয়।

একাদশ অধ্যায়

আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্ব নারী-পুরুষ সম্পর্ক, সামাজিক ভূমিকা এবং অধিকার বিষয়ে দুটি স্বতন্ত্র দার্শনিক কাঠামো উপস্থাপন করে। যদিও উভয় দৃষ্টিভঙ্গিই নারীর মর্যাদা ও অবস্থান উন্নয়নের দাবি করে, তাদের ভিত্তিগত অনুমান, মূল্যবোধ ও প্রয়োগের ক্ষেত্র ভিন্ন।

আধুনিক নারীবাদ (Modern Feminism) মূলত লিঙ্গভিত্তিক সমতার (gender equality) ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে নারী ও পুরুষকে প্রায় সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভিন্ন অধিকার ও সুযোগের অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তিস্বাধীনতা (individual autonomy) ও স্বনির্ধারণ (self-determination) কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। ফলে সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর সীমাবদ্ধতাকে অনেক ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা হিসেবে দেখা হয়।

অন্যদিকে, ইসলামি নারীত্ব নারীকে মানবিক মর্যাদায় পুরুষের সমান হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও ভূমিকা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে পার্থক্যকে স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত (equitable differentiation) হিসেবে বিবেচনা করে। এখানে ন্যায়, ভারসাম্য এবং দায়িত্ব

ধারণা নারীর অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলাম নারীকে শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক অংশগ্রহণ ও পারিবারিক মর্যাদায় স্বীকৃতি প্রদান করে, তবে তা নৈতিক ও ধর্মীয় সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ।

পরিবার কাঠামোর ক্ষেত্রেও উভয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্পষ্ট। নারীবাদী চিন্তাধারায় পরিবারকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দনির্ভর সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগ্রাধিকার পায়। বিপরীতে, ইসলাম পরিবারকে সমাজের মৌলিক একক (basic unit of society) হিসেবে বিবেচনা করে এবং মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও পারিবারিক দায়িত্বকে সামাজিক স্থিতিশীলতার কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে উপস্থাপন করে।

পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নারীবাদে নারীর পরিচয় প্রধানত তার ব্যক্তিগত অর্জন ও স্বাধীন সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল, যেখানে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর পরিচয় তাকওয়া , চরিত্র ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, আধুনিক নারীবাদ অধিকতর সমতা ও স্বাধীনতাকেন্দ্রিক একটি সামাজিক দর্শন, আর ইসলামি নারীত্ব ন্যায়ভিত্তিক ভারসাম্য ও দায়িত্বকেন্দ্রিক একটি নৈতিক কাঠামো উপস্থাপন করে।

আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্ব: তুলনামূলক ছক

বিষয়	**আধুনিক নারীবাদ (Modern Feminism)**	**ইসলামি নারীত্ব (Islamic Womanhood)**
১. মূল দর্শন	লিঙ্গ সমতা (Gender Equality)	ন্যায় ও ভারসাম্য (Justice & Equity)
২. নারীর পরিচয়	ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অর্জনভিত্তিক	ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অর্জনভিত্তিক
৩. স্বাধীনতার ধারণা	প্রায় সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা	নৈতিক ও ধর্মীয় সীমার মধ্যে স্বাধীনতা
৪. অধিকার	সমান অধিকার (Equal rights in all fields) মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার	মর্যাদা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার

৫. নারী-পুরুষ সম্পর্ক	সমান অবস্থান ও ভূমিকা	সমান মর্যাদা, ভিন্ন দায়িত্ব
৬.পরিবার ধারণা	ব্যক্তিগত পছন্দনির্ভর প্রতিষ্ঠান	সমাজের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো
৭.মাতৃত্বের ভূমিকা	ব্যক্তিগত পছন্দ (optional role)	সম্মানিত ও কেন্দ্রীয় দায়িত্ব
৮.কর্মজীবন	পূর্ণ স্বাধীন অংশগ্রহণ	অনুমোদিত, তবে দায়িত্ব ও শর্তসাপেক্ষ
৯.বিবাহের দৃষ্টিভঙ্গি	চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রধান	ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্বসহ পবিত্র বন্ধন
১০.সামাজিক ভূমিকা	ব্যক্তিগত সক্ষমতা ও পছন্দভিত্তিক	দায়িত্ব ও নৈতিক কাঠামো নির্ভর
১১. আইন ও ধর্ম	ধর্মীয় কাঠামোর প্রভাব সীমিত	শরিয়াহ ও নৈতিকতার ভিত্তি
শরীর ও পোশাক	ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পছন্দ	শালীনতা (haya) ও পর্দার ধারণা
১৩. সমতা ধারণা	অভিন্ন আচরণ ও সুযোগ	ন্যায়সঙ্গত বণ্টন (equity)
ক্ষমতার ধারণা	সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অধিকার সম্প্রসারণ	দায়িত্বসহ মর্যাদা ও কর্তব্য
১৫. সমাজে লক্ষ্য	ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমতা প্রতিষ্ঠা	নৈতিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ

এই অধ্যায়ের তুলনামূলক আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক নারীবাদ মূলত সমতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণাকে কেন্দ্র করে নারীর ভূমিকা নির্ধারণ করে, যেখানে সামাজিক কাঠামোর তুলনায় ব্যক্তিগত পছন্দকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। অপরদিকে ইসলামি নারীত্ব নারীকে মর্যাদায় সমান স্বীকৃতি দিলেও ন্যায় ও ভারসাম্যের ভিত্তিতে তার দায়িত্ব ও ভূমিকা নির্ধারণ করে এবং স্বাধীনতাকে নৈতিক ও শরঈ সীমার মধ্যে সংযত রাখে। ফলে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী পরিবার ও সমাজের স্থিতিশীলতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দায়িত্বশীল অবস্থানে অধিষ্ঠিত থাকে।

উপসংহার

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম; আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৩)

এই গবেষণায় "আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামি নারীত্ব: নারীর সম্মান ও অধিকার বিশ্লেষণ" শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে নারীর মর্যাদা, অধিকার এবং সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটি তুলনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের আগমনের পূর্বে নারীর অবস্থা, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার, এবং আধুনিক নারীবাদের ধারণা, এই তিনটি মূল প্রেক্ষাপটে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারীর মর্যাদাকে শুধু সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তা হিসেবে সম্মান, অধিকার ও দায়িত্বের ভারসাম্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কুরআন ও সহিহ হাদিসের নির্দেশনায় নারীর জীবন, সম্পদ, শিক্ষা, বিবাহ ও পারিবারিক অবস্থানকে

সুরক্ষিত করা হয়েছে, যা সে সময়ের সমাজে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে বিবেচিত হয়।

অন্যদিকে আধুনিক নারীবাদ নারীর অধিকার ও সমতার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে নারীর সামাজিক অংশগ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। তবে এর কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিস্বাধীনতার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ও সামাজিক কাঠামোর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা তৈরি করেছে বলে সমালোচকদের মত পাওয়া যায়।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ইসলাম নারীর অধিকারকে নৈতিকতা, দায়িত্ব ও পারিবারিক ভারসাম্যের সাথে সমন্বয় করে একটি সুষম জীবনব্যবস্থা প্রদান করে, যেখানে আধুনিক নারীবাদ অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমতার ধারণাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। ফলে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বিদ্যমান।

সর্বশেষে বলা যায়, নারীর সম্মান ও অধিকার একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যা কেবল সামাজিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ নয়, বরং নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে বোঝা প্রয়োজন। এই গবেষণা নারীর অবস্থান সম্পর্কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা গঠনে সহায়ক হবে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

[i]

সমাপ্ত

[i] মহান রব্বুল আলামীন এর সীমাহীন প্রসংশা, যিনি আমাকে এই থিসিসটি আফিয়াতের সাথে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দিয়েছেন।